হেমন্তের পাখি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭২

প্রকাশক ঃ
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীআলোকময়

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২, ছিদাম মুদী লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

খাঁচার টিয়াটাকে বুলি শেখানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল অদিতি। রোজই চালায়, এই দুপুরবেলায়। অদিতির নির্জন সময়ে। পাখি কথা বলবে না, অদিতিও বলাবেই, দু'জনের এ এক ভারী নিভৃত খেলা।

মাসখানেক আগে রাস্তার এক পাখিওয়ালার কাছ থেকে টিয়াটা কিনেছে অদিতি। করকরে আশি টাকায়। পাখিটা খুব বাচ্চা নয়, মোটামুটি বড়ই। পাকা সবুজ রঙ, পরিণত ডানা, গলা জুড়ে বকলসের মতো স্পষ্ট কালো দাগ। বেচার সময়ে লোকটা অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিল। সেলসম্যানশিপে সুপ্রতিমকেও বুঝি হার মানায়। নিয়ে নিন বউদি, একদম তৈরি পাখি, সাত দিনে পোষ মেনে যাবে! জাত দেখেছেন, আস্‌লি সিঙ্গাপুরী টিয়া! এ পাখি কথা বলে না, লেকচার দেয়! যা শুনবে তাই আউড়ে যাবে সারাদিন! হাত বাড়াবেন, হাতে চলে আসবে! কাঁধে চড়ে ঘুরবে, ঠিক যেন ঘরের ছেলে! দেখবেন, আপনারই তখন খাঁচায় পুরতে মায়া হবে!

কিন্তু পাখি কথা বলে কই! এক মাস ধরে বিশ্রী একটা কর্কশ ডাক ছাড়া আর কিছুই তো এল না অদিতির কানে। পোষ মানা দূরস্থান, খাঁচা খুলে ছোলা দিতে গেলেও ক্যাঁ ক্যাঁ করে তেড়ে আসে। সুপ্রতিম আর পাপাই তাতাই-এর সামনে অদিতি বেইজ্জতের একশেষ। বাপ আর দুই ছেলে তিনজনই একমত। টিয়াটা বুড়ো। টিয়াটা গোঙা।

অদিতির বিশ্বাস হতে চায় না। এমনও তো হতে পারে টিয়াটা খুব তেজি, প্রখর বুদ্ধিমান। হয়তো ভাবছে অদিতি নিজেই একদিন বিরক্ত হয়ে খাঁচার দরজা খুলে দেবে, ওমনি ও ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে আকাশে! অথবা ওর মনে এখনও ফেলে আসা নদী জঙ্গল গাছ আকাশের ছবি অম্লান! সেই স্মৃতি ধুয়ে-মুছে সাফ না হওয়া পর্যন্ত হয়তো কথা বলবে না বলে পণ করে রেখেছে টিয়া।

নাহ্, অদিতির হাল ছাড়লে চলবে না। পাপাইটা ছোটবেলায় অঙ্কে কী কাঁচাই না ছিল, সামান্য গুণ ভাগ করতে দিলে সিঁটিয়ে যেত, চিবিয়ে চিবিয়ে ভুষ্টিনাশ করত পেনসিলের। বুঝতে পারছি না মা! হচ্ছে না মা! পারব না মা! সেই ছেলের পিছনে লেগে থেকে থেকে সে এখন অঙ্কে রীতিমতো পালোয়ান। মাধ্যমিকে অঙ্কে সাতানব্বই, উচ্চমাধ্যমিকে একশো নব্বই, ইন্টার স্কুল অঙ্ক কম্পিটিশানেও কুস্তি লড়ে প্রাইজ পেয়েছে কত। এখন পাপাই-এর

থার্ড ইয়ারের ক্লাশমেটরা ফিজিক্সের জটিল অঙ্ক নিয়ে পাপাই-এর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। অঙ্ক ভয় দূর করার থেকেও কি পাখির মুখে বুলি ফোটানো কঠিন ?

ব্যালকনির রডে ঝোলানো লোহার খাঁচাটাকে একটু দুলিয়ে দিল অদিতি। নিচু স্বরে বলল,—কিরে, কথা বলবি না ?

টিয়া তরতর জাল বেয়ে উল্টোদিকে চলে গেল।

অদিতি দ্রুত ঘুরে গেল সেদিকে। খাঁচার তারে মুখ রেখে নরম করে বলল,—বল সুপ্রতিম। সু-প্র-তি-ম। বল বল।

টিয়ার মোটেই যুক্তাক্ষরে আগ্রহ নেই। একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল অদিতিকে, আবার সরে গেছে।

—বুঝেছি। আমার বরটাকে তোর পছন্দ নয়। হবেই বা কেন, ও কি তোকে ভালবাসে !

টিয়ার এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। চুপ, যেন সায় দিচ্ছে।

অদিতি ঠোঁট টিপে হাসল,—বেশ তবে পাপাই তাতাইকে ডাক। বল পাপ্‌পাই। তাত্‌তাই।

কুৎসিত আওয়াজ করে খাঁচার মেঝেতে বসল টিয়া। বসেই লাফিয়ে উঠেছে। ঝটপট করছে খাঁচা জুড়ে।

—কী অসভ্য রে তুই ! দাদাদেরও পছন্দ নয় !

তড়াং করে খাঁচার মাথায় ঝুলে জিমন্যাসটিক দেখাচ্ছে টিয়া।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। কাউকে ডাকতে হবে না। আমাকেই ডাক। অদিতি। অ-দি-তি।

দাঁড়ে বসেছে টিয়া। দুলছে অস্থির ভাবে। ঘন ঘন চোখ টিপছে।

অদিতি ফিসফিস করে বলল,—অদিতিও কঠিন লাগছে ? খুকু বলে ডাকবি ? বল খুউকু। খুউকুউ।

অদিতির দুই ছেলেই ছোটবেলায় নাম ধরে ডাকত অদিতিকে। খুকু। সুপ্রতিমই শিখিয়েছিল। ছোটর তো অনেক বড় অবধি অভ্যেসটা ছিল। ক্লাশ ফাইভে উঠেও তাতাই মাকে বলত খুকুমা। অদিতি ছেলেকে বকত খুব। এখন কেন যে সেই ডাকটাই শুনতে ইচ্ছে করে অদিতির !

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে অদিতি বলল,—একবারটি খুকুমা বলে ডাকবি আমাকে ? ডাক না। বল খু-কু-মা।

এতক্ষণে টিয়ার মুখে বোল এসেছে,—ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ।

—এই পাজি, চেঁচাচ্ছিস কেন ?

—ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ।

—যা, তোর সঙ্গে কথাই বলব না। ওরা তোকে ঠিক চিনেছে। তুই একটা বুড়োর হদ্দ। সাত জংলির এক জংলি !

বিরক্ত হয়ে খাঁচার পাশ থেকে সরে এল অদিতি। গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ

চোখে দেখছে পাখিটাকে। সত্যিই কি পাখিওয়ালা তাকে ডাহা ঠকিয়ে গেল? বেশি দাম নিয়ে রদ্দি টিয়া গছিয়ে গেল একটা?

তা অদিতির ঠকা অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়। এর আগে একবার কত শখ করে একটা নেপালি ময়না পুষেছিল অদিতি। হাঁ করে খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, এই বুঝি পাখি মানুষের স্বরে কথা বলে ওঠে! হায় কপাল, পাখি শুধু গেলে আর খাঁচা নোংরা করে। শেষে একদিন বাপ-ছেলেদের তুমুল হর্ষধ্বনির মাঝে খাঁচা খোলা পেয়ে পুঁই করে উড়ে পালাল পাখিটা। সবাই বলল, ওটা নাকি গাঙ্‌শালিখ্‌ ছিল! অদিতি চিনতে ভুল করেছে! হবেও বা। আর একবার, পাপাই তাতাই তখন বেশ ছোট, দুই ছেলেকে নিয়ে রাসবিহারীর রথের মেলা থেকে চারটে মুনিয়া কিনে এনেছিল অদিতি। সবুজ-হলুদ কালো-বাদামী নীল-খয়েরি কী তাদের রঙের বাহার! দুই ছেলে পিচকিরিতে জল ভরে ক'দিন তাদের স্নান করাতেই বর্ণচোরা মুনিয়ারা ক্যাটকেটে চড়ুই!

সুপ্রতিম সেবার খুব চটেছিল। তিরিশটা টাকা নষ্ট করার জন্য কম খোঁটা দেয়নি অদিতিকে। রোজগার তো করো না, টাকার মর্ম বুঝবে কী! এখন অবশ্য সামান্য আশি টাকা গলে যাওয়াতে সুপ্রতিমের কিছু যায় আসে না। সে তো আর কোম্পানির সেই ছুটন্ত ফেরিওয়ালা নেই, রীতিমতো লোটাস ইন্ডিয়ার দাপুটে এরিয়া ম্যানেজার।

পাখিটার দিকে আরও খানিকক্ষণ কটমট তাকিয়ে থেকে ঘরে ফিরল অদিতি। কাচা জামাকাপড় বিছানায় স্তূপ করে গেছে মলিনার মা, সেগুলোকে নিয়ে পড়ল। পাপাই তাতাই-এর শর্টস টি-শার্ট, সুপ্রতিমের গেঞ্জি পাজামা, নিজের শাড়ি সায়া ব্লাউজ পাট করল আলাদা আলাদা করে। কোনওটা রাখল আলনায়, কোনওটা দিয়ে এল ছেলেদের ঘরে, কোনওটা আলমারিতে তুলল। খাটে শুয়ে গড়াল খানিকক্ষণ। পড়া খবরের কাগজ নতুন করে উল্টোল, সরিয়ে রাখল, আবার শুয়ে রইল চোখ বুজে। ঘুমও ছাই আসে না, আবার এসে গেলেও বিপদ। সারা বিকেল গলা জ্বলবে, সারা সন্ধে টক ঢেকুর। অপারেশনের পর থেকে অম্বলের রোগটা যেন আরও বেড়ে গেল। আবার কি পাখিটাকে নিয়ে পড়বে, নাকি গড়াবে আর একটু? উল কাঁটা নিয়ে বসলে কেমন হয়! ধুস্‌, কী হবে? ছেলেরা তো আজকাল কেনা সোয়েটার বেশি পছন্দ করে।

অদিতি যে এখন কী করে? কী করে?

হেমন্ত চলছে। শরৎ আর শীতের মাঝে হেমন্ত ঋতুটা যেন কেমনতর। কখন যে একটা পাতলা কুয়াশায় মুখ লুকিয়ে চুপিসাড়ে এসে যায়। তারপর যেন আর কাটতেই চায় না, কাটতেই চায় না। বাতাস শুকনো হয়ে আসে, চামড়ায় টান ধরে, এক হিমঋতুর পদধ্বনি শোনা যায় দূরে। কিন্তু আসে না শীত। তখনও যেন শরতের গন্ধ লেগে থাকে বাতাসে। উচ্ছল শরৎ আর

হাড়-কাঁপানো শীত, মাঝের সময়টা বড় নিশ্চেতন। প্রলম্বিত।

ফোন বাজছে। উঠল অদিতি। ছুটল না, অলস পায়ে এল ড্রয়িংস্পেসে। মন্থর হাতে রিসিভার তুলল। সুপ্রতিম।

—কী ব্যাপার, ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?

—না, এই...একটু...

—পারোও বটে। সুখে আছ।

—এই বলার জন্য ফোন করেছ ?

—ঘুম ভাঙালাম বলে চটেছ মনে হচ্ছে ?

অদিতি একা একাই ম্লান হাসল,—কী বলবে বলো না।

সুপ্রতিম কি একটু সময় নিল ? না বোধ হয়। কাজের কথাটা পেড়েছে,—একটু দ্যাখো তো, শোওয়ার ঘরের টেবিলে কি আমি একটা গোলাপি ফাইল ফেলে এসেছি ?

—ধরো, দেখছি। দ্রুত পায়ে শোওয়ার ঘর ঘুরে এল অদিতি, —হ্যাঁ, পড়ে আছে।

—বাঁচালে। আমি ভাবছিলাম শেয়ার ট্যাক্সিতে ফেলে এলাম। একগাদা দরকারি পেপারস আছে ফাইলটায়।

—তুমি আজ ব্রিফকেস নিয়ে বেরোওনি ?

—কেন, তুমি দ্যাখোনি আমি ক'দিন ধরে ব্রিফকেস নিয়ে বেরোচ্ছি না !

অদিতি বলতে পারত, খেয়াল করিনি। খেয়াল করার সময়ই বা কোথায় সকালে ! পাপাই তাতাই এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকে। ওই একটা সময়ে এখনও তাদের মাকে দরকার। ট্রাউজারটায় একটু ইস্ত্রি চালিয়ে দাও না মা ! শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেছে, চটপট লাগিয়ে দাও তো ! ইস্, আমাকে এত ভাত দিয়েছ কেন, ওঠাও ওঠাও ! তার মধ্যেও সুপ্রতিমের টাইটা মোজাটা রুমালটা খাটের বাজুতে রেখে আসে অদিতি। শুধু সুপ্রতিমের যাত্রাকালে দরজায় গিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গাটাই করা হয়ে ওঠে না। বহুকাল যাবৎই।

হালকা ভাবে অদিতি অন্য কথায় গেল,—অতই যদি দরকারি ফাইল, অফিসে যাওয়ার চার ঘণ্টা পরে মনে পড়ল কেন ?

চটজলদি জবাব এসে গেল,—অফিস তো আর করলে না, দিব্যি শুয়ে বসে জীবন কেটে গেল। ফার্স্ট আওয়ারে এসেই সেলসের ছেলেদের নিয়ে মিটিং-এ বসেছিলাম, একটু ফাঁক পেতে তবে মনে পড়ল।

—ও। ফস্ করে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসল অদিতি, —ফিরছ কখন ?

—আমি ? আজ ? সুপ্রতিমও যেন কোনও আজগুবি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—যেমন ফিরি। সাড়ে ন'টা। দশটা। পাটনার এজেন্ট এসেছে, ওকে নিয়ে সন্ধেবেলা একটু বসতে হবে।

—বেশি গিলো না। প্রেসারটা বেড়েছিল, খেয়াল রেখো।

—জানি। জ্ঞান মারতে হবে না।

—হুঁহ্, তাও যদি বোতল দেখলে জ্ঞান থাকত! বাড়ি ফিরে খাবে তো, না কালকের মতো খাবার নষ্ট হবে?

—অফকোর্স খাব। আমি আজ হোটেলবাজি করতে যাচ্ছি না। রাখছি।

কট। দাম্পত্য আলাপ শেষ। রিসিভারটা হাতে নিয়ে অদিতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কয়েক সেকেন্ড। নাকি আরও বেশি? সময় যখন কাটে না, কয়েক সেকেন্ডও এত দীর্ঘ হয়ে যায়! মাত্র সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের আসবাব ভরা ফ্ল্যাটটাকেও মনে হয় জনহীন প্রান্তর।

রিসিভার একটানা কুঁ কুঁ কুঁ কুঁ শব্দ করে চলেছে। যেন বলছে রাখ রাখ রাখ রাখ। রিসিভারটাকে আঁচলে ঘষে খানিকটা চকচকে করল অদিতি, রেখে দিল ক্রেডলে। যন্ত্রটার এ বাড়িতে তিন বছর বয়স হল। একমাত্র কাজের কথা ছাড়া আজ পর্যন্ত টেলিফোনে কোনও নরম-সরম কথা বলল না সুপ্রতিম। অদিতি মাঝে মাঝে ভাবে, বিয়ে হয়ে অদিতি যখন শ্বশুরবাড়িতে এল, তখন যদি ও বাড়িতে টেলিফোন থাকত, সুপ্রতিম কি তখনও দুপুরবেলা এরকম নিরস স্বরে ফোন করত অদিতিকে? মনে হয় না। সুপ্রতিমের তখন যথেষ্ট রসকষ ছিল। কী মিষ্টি একটা নামে ডাকত অদিতিকে। ফুল। এখনও ডাকে। ক্বচিৎ কখনও। ফুল ভেবে নয়, বোকা ভেবে।

অন্যমনস্কভাবে সোফাগুলো ঝাড়ছিল অদিতি। মলিনার মা যত্ন করেই ঝাড়াঝুড়ি করে, তবু যেন অদিতির ঠিক তৃপ্তি হয় না। ক্যাবিনেটের গায়ে, সেন্টার টেবিলে, টিভি-র কাচে সর্বত্রই অদৃশ্য ধুলোর কণা দেখতে পায় অদিতি। এগুলোই কি সংসারের মায়া?

কিছুক্ষণ অদিতি ঝুম হয়ে বসে রইল সোফায়। কী ভেবে উঠে টিভি-টা চালিয়ে দিল। আবার বসল। একা একা টিভি দেখতেও ভাল লাগে না অদিতির। পর্দায় চলমান ছবি ভেসে উঠছে, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ গান গাইছে, কেউ ভালবাসছে কাউকে, কেউ কাউকে মেরে ফেলছে আর অদিতি একা বোকার মতো বসে বসে দেখছে তাদের—সবই কেমন অলীক লাগে অদিতির। পর্দার মানুষগুলোর সঙ্গে কিছুতেই ঠিকঠাক সংযোগ ঘটে না তার। যেন মনে হয় পুতুলের নড়াচড়া দেখছে, সে-ও এক পুতুল। কেউ যদি পাশে বসে অদিতির সঙ্গে দৃশ্যটার রস ভাগাভাগিই না করল, তবে সেই দৃশ্য দেখে অদিতির কীসের আনন্দ? পাপাই তাতাই ক্রিকেট টেনিস চালিয়ে রাখলেও অদিতি সারাদিন বসে দেখতে পারে, কিন্তু একা একা... !

দু'-তিন বছর আগেও অদিতির দুপুরটা অনেক অন্য রকম ছিল। মাধ্যমিকের আগে পর্যন্ত তাতাই-এর ছিল মর্নিং স্কুল, সারা দুপুরই তখন গমগম করত বাড়ি। এই তাতাই দড়াম করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করল। এই গান গাইছে গলা ছেড়ে। একবার ফুল ভলিউমে টিভি চালিয়ে দিল, একবার টেপ। সঙ্গে অনবরত হাঁকডাক। মা, আমার ব্রায়ান অ্যাডামস-এর ক্যাসেটটা কোথায় গেল? মা, দাদা আজ আবার আমার টি-শার্ট পরে বেরিয়েছে, তুমি দেখতে

পারো না ? মা ফ্রিজে দেখছি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে, খাব ? দূর ছাই, ওয়াকম্যানটা কোথায় রাখলাম ? ও মা, খুঁজে দাও না। মা মা মা মা মা। অস্থির অস্থির লাগত অদিতির।

এখন চতুর্দিক দমচাপা রকমের ফাঁকা।

তাও তাতাই এখনও কিছুটা ছেলেমানুষ আছে। অদিতিকে জড়িয়ে ধরে এখনও হুমহাম আবদার চালায়। পাপাইটা যেন পুরোপুরি লোক হয়ে গেল। অথচ ওই ছেলেই পাঁচ বছর আগেও কী মা-ঘেঁষাই না ছিল ! স্কুল টিউটোরিয়াল খেলার মাঠ বন্ধুবান্ধব, রাজ্যের সব গল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ মাকে বলা চাই। অদিতি শুনতে না চাইলেও কানের কাছে বকবক করে যাবে। এখন পাপাই বাড়িতে কথা বলারই সময় পায় না।

অদিতির দুই ছেলেই বৃত্ত পেয়ে যাচ্ছে।

বৃত্ত, না ডানা ?

পাপাই তাতাই উড়ে যাচ্ছে ডানা মেলে। মাঝে মাঝে ফিরবে কুলায়। আবার ওড়া। আবার ওড়া। ওদের সামনে এখন সুনীল আকাশ।

আর অদিতির সামনে এই ফ্ল্যাট। সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের এক আদিগন্ত ধুধু মাঠ।

অদিতি নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রঙিন পর্দায়। সম্ভবত পুরনো দিনের সিনেমার গান হচ্ছে টিভি-তে। অদিতি দেখছেও না, শুনছেও না। পৌনে তিনটে বাজে। চারটে নাগাদ মলিনার মা বাসন মাজতে আসবে, সাড়ে চারটেয় রান্না করতে সবিতা। ছেলেরা ফিরতেও পারে, নাও ফিরতে পারে। তাদের জন্য জলখাবার করে রেখে লাভ নেই, এলে দেখা যাবে। প্রেশারে খানিকটা মটর সেদ্ধ করা আছে, চটপট ঘুগনি বানিয়ে দেবেখন। সন্ধেবেলা অদিতির একবার দাসপাড়া বাজারে যাওয়া দরকার। কাল সকালে পাপাই-এর স্যারের কাছে পড়তে যাওয়া আছে, বাজার যেতে পারবে না, রাতেই মাছটা সবজিটা কিনে রাখতে হবে অদিতিকে। টুথপেস্ট ফুরিয়ে এসেছে, গায়ে মাখার সাবানও। ও সব অবশ্য সামনের দোকান থেকেই সওদা করা যায়। সুপ্রতিম জুতোর ফিতের কথা বলছিল, দাসপাড়া বাজারে পাওয়া যাবে কি ? পাখির ছোলাও শেষ, আজই কিনে এনে ভিজিয়ে রাখতে হবে রাতে।

পাখির কথা মনে পড়তেই অদিতির বুকটা খচখচ করে উঠল। ডাহা ঠকে গেল পাখিটা কিনে ? সামান্য ক'টা টাকার জন্য কেন যে মানুষ মানুষকে ঠকায় ! চাইলে তো পাখিওয়ালাকে এমনিই দশ বিশ টাকা দিতে পারত অদিতি ! দেয়ও তো। মোড়ের ইস্ত্রিওয়ালাটা বাচ্চার ওষুধ কেনার জন্য এই তো গত মাসে পঞ্চাশটা টাকা নিল, অদিতি কি ফেরত চাইতে গেছে টাকা ? যেচে না দিলে অদিতি চাইতেও পারবে না।

যাক গে, ঠকাক গে। অদিতির যে দুপুরের অনেকটাই এখন টিয়াটাকে নিয়ে কাটে, তার দাম কে চায় !

অদিতি একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল পাখিটাকে। ঘাড় কাত করে কী যেন শুনছে টিয়া! কী শুনছে? গান? টিভি-র?

তড়াং করে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছে অদিতির। পাখিওয়ালা কী যেন বলেছিল! টিভি-টা একটু জোরে ছেড়ে দেবেন বউদি, পাখি গান শুনে শিস শিখে যাবে!

শিস তো অদিতি নিজেই শেখাতে পারে, তার জন্য টিভি-র কি প্রয়োজন? পাপাই তাতাইকে কত শিস দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে অদিতি।

বহুকালের অনভ্যাস, এখন কি আর বাতাস বাজবে!

অদিতি ঠোঁট সরু করে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা বাতাস ঠেলল বুক থেকে। দিব্যি বাজছে! সাইকেল আর সাঁতারের মতো শিসও কি মস্তিষ্কে গেঁথে যায়!

দ্রুত টিভি বন্ধ করে ব্যালকনিতে ফিরেছে অদিতি। এদিক ওদিকের ফ্ল্যাটের দিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে নিল। একই কম্পাউন্ডে সামনে পাশে আরও তিনটে ফ্ল্যাটবাড়ি, হেমন্তের দুপুরে সব ফ্ল্যাটই মিঠেকড়া রোদ্দুর মেখে ঝিমোচ্ছে। কোনও ব্যালকনিতেই কেউ নেই। না, একজন আছে। সামনের ফ্ল্যাটের চারতলায়। শিপ্রার বুড়ি শাশুড়ি। বুড়ি চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, তবু ওই বারান্দাতে বসে আছে সর্বসময়। কী ছাই দেখে কে জানে? হয়তো আলো বাতাসের ঘ্রাণ নেয়!

খাঁচার খুব কাছে গিয়ে ঠোঁট সরু করল অদিতি। ছোট্ট একটা শিস দিল।

টিয়া চমকে তাকিয়েছে।

অদিতি আবার শিস দিল। এবার একটু লম্বা।

টিয়ার ঘাড় কাত সামান্য, শুনছে। লাল টুকটুক ঠোঁট কি কেঁপে উঠল?

অদিতি মজা পেয়ে গেল। ঘন ঘন শিস দিচ্ছে।

টিয়াটাও চমকিত হয়ে তাকাচ্ছে বার বার।

বুক থেকে বাতাস ঠেলে ঠেলে শিসটাকে সুরে নিয়ে গেল অদিতি। সুন্দর একটা ছন্দে বেঁধে ফেলল। বাহ্, বেশ তো বাজছে!

কলেজে পড়ার সময়ে শিস দিয়ে বাজারচলতি গান তোলা জল-ভাত ছিল অদিতির। ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই-এর মন কাড়া শিসটা ধরা ছিল ঠোঁটে, হানিমুনে সুপ্রতিমকে শুনিয়েছিল। পুরীর সমুদ্রপাড়ে। ঢেউ-এর সামনে বসে আছে দু'জনে, ঢেউ-এর সঙ্গে দুলছে অদিতির শিস। দুলছে শিস, দুলছে সুর। সুপ্রতিম অভিভূত। সুপ্রতিম বিমোহিত। নতুন বউ শিস দিয়ে গান শোনায়! নিজেও সুপ্রতিম চেষ্টা করল বারকয়েক, পারল না, মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফুক ফুক বাতাস বেরিয়ে গেল। অদিতি হেসে কুটিপাটি। হাল ছেড়ে অদিতিকে জড়িয়ে ধরেছে সুপ্রতিম। আর একবার করো, আর একবার করো।

নেশা ধরে গিয়েছিল সুপ্রতিমের। নইলে রাতে হোটেলের নিবিড় শয্যাতে বউকে বলে শিস শোনাও! অদিতির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপেছিল হঠাৎ, স্কুলের এক ফক্কড় বন্ধুর কাছে শেখা লক্কা সিটিটা বাজিয়ে দিল শুয়ে শুয়ে। জিভের

নীচে দু'আঙুল রেখে। কী তার আওয়াজ ! পুঁই পুঁউইইই ! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গেছে সুপ্রতিম। তার হাতের ঝটকায় টেবিলে রাখা কাচের ফুলদানি ভেঙে খান খান। পাশের রুমে ছোট্ট এক মাদ্রাজি পরিবার ছিল, বাবা মা ছেলে মেয়ে। চারজনই পরদিন সকালে জুলজুল চোখে দেখছে সুপ্রতিমকে। হয়তো ভেবেছে এটাই বোধ হয় বাঙালিদের প্রেম করার নতুন রীতি।

আজ একবার সিটিটা বাজিয়ে দেখবে অদিতি ? কেউ তো কোত্থাও নেই, কে আর জানছে !

অদিতি শিপ্রার শাশুড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। মুখে আঙুল পুরেও থেমে গেছে সহসা। এ কী ছেলেমানুষি ! ফ্ল্যাটবাড়িতে কোথায় যে কোন চোখ ঘোরাফেরা করে !

ক'মাস আগে এক খ্যাপামি পেয়ে বসেছিল অদিতিকে। বাড়ি ফাঁকা হলেই অদিতি ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে যেত। যত রাজ্যের পাউডার ক্রিম লিপস্টিক মাখত বসে বসে। মুখ চোখ রঙিন করেই তৃপ্তি হত না, সুপ্রতিমের প্যান্টশার্ট বার করে পরত, তারপর মডেলদের মতো হেঁটে বেড়াত ফ্ল্যাটময়। বেড়ালের মতো হাঁটছে। সিংহের মতো হাঁটছে। ময়ূরীর মতো হাঁটছে। কী একটা শব্দ শুনে একদিন বুঝি উঁকি দিয়েছিল ব্যালকনিতে, ব্যস অমনি ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। বাড়ির লোকদের কৈফিয়ত দিতে দিতে অদিতি জেরবার। যাহ ভুল দেখেছে, যাহ ভুল দেখেছে, বলতে বলতে গলা চিরে গিয়েছিল অদিতির। এখন অদিতির সিটি যদি কেউ শুনে ফেলে, পাপাই তাতাই নির্ঘাত এই পঁয়তাল্লিশ বছরের মা-টাকে রাঁচিতে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

রাঁচির রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে অদিতি, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছে পাগলা-গারদটা কোথায়, মাঝবয়সী পাগলিনীর প্রশ্ন শুনে ছিটকে যাচ্ছে পথচারী, পালাচ্ছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, তাদের পিছনে ধাওয়া করছে অদিতি... মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে অদিতি নিজের মনে হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে ফিরল ঘরে।

খাটে শুয়েও হাসছে। চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল, পেটও। শেষে আর হাসতে পারছে না অদিতি, তবু তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়েই আছে।

হাসি ফুরোতে আবার সেই সমস্যা। সময় থেমে গেল।

সাইড টেবিলের নীচ থেকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করল অদিতি। পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু উল্টেপাল্টে ছবি দেখছে। রেখে দিয়ে উঠে ছেলেদের ঘরে এল, টেবিল ঘাঁটল পাপাই-এর। ইয়া মোটা এক ইংরিজি থ্রিলার, সামনের মলাটে অর্ধনগ্ন নারী আর মেশিনগান। পিছন-মলাটে কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার। একবার চোখ বুলিয়ে নাক কুঁচকোল অদিতি, রেখে দিল। আবার ফিরে এসে শোকেস থেকে একটা বাংলা বই বার করেছে। ধুস, সবই তো পড়া, এক বই কত বার পড়া যায় ! পাড়ায় যদি একটা লাইব্রেরিও

থাকত ! জামির লেনে অদিতির শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় কী ভাল একটা গ্রন্থাগার ছিল, শ্বশুরমশাই পাল্টে পাল্টে বই নিয়ে আসতেন, ছেলে কোলে নিয়ে গপগপ বই গিলত অদিতি।

ছোট ছোট অগুন্তি কালো পিঁপড়ে লাইন দিয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠছে। কী যেন সাদা সাদা গুঁড়ো মুখে করে নিয়ে চলেছে সকলে। ভারী সুশৃঙ্খল এক পদযাত্রা। শীতের প্রস্তুতি। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত চলে গেছে পিঁপড়ের সারি। ঠিক সরলরেখাও নয়, বক্ররেখাও নয়, যেন এক সাদা ফুটকিঅলা কালো সুতো ঝুলছে দেওয়ালে। কাঁপছে মৃদু মৃদু। সিলিং-এ পৌঁছে ছড়িয়ে পড়ছে পিঁপড়েরা, সে এক অপরূপ জ্যামিতিক নক্‌শা।

দৃশ্যটা ছিঁড়ে গেল। ডোরবেল বাজছে। মলিনার মা এল বোধ হয়।

দরজা খুলে অদিতি বিস্মিত। এক কুঁজোটে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, কাঁধে সুতির চাদর, হাতে একটা লম্বা ডাঁটির ছাতা। অদিতির দিকে তাকিয়ে লোকটা হাসছে মিটিমিটি।

চেনা চেনা যেন ! কে !

চশমাপরা লম্বাটে তোবড়ানো মুখে রহস্যের হাসি,—কি, চিনতে পারছ না ?

কথা বলতেই অদিতি চিনেছে লোকটাকে। ওই গমগমে স্বরেই।

হেমেনমামা না !

॥ দুই ॥

রাত্রে খাবার টেবিলে অদিতি বলল, —জানো, আজ একজন এসেছিল বাড়িতে।

ঘুগনির বাটিতে পেঁয়াজকুচি ছড়াচ্ছিল সুপ্রতিম, মুখ না তুলেই প্রশ্ন করল,—কে ?

—হেমেনমামা।

—কে মামা ? সুপ্রতিম কপাল কুঁচকে ছেলেদের দিকে তাকাল, —এই, তোরা একটু থামবি ? খাবার টেবিলে ঝগড়া না করলে কি তোদের রুটি হজম হয় না ?

দু' ভাইতে ক্রিকেট নিয়ে লেগেছে আজ। ভারতীয় ক্রিকেট দল কোথায় যেন বিদেশ সফরে যাবে, খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাতাই-এর একটুও পছন্দ হয়নি টিমটা। সদ্য কলেজে ঢোকার সুবাদে তাতাই এখন প্রায় সর্বজ্ঞ, অথচ দু'বছরের ছোট ভাইকে নেহাতই নাবালক ভাবে পাপাই, পাত্তাই দিতে চায় না। তর্কের সময়ে সে নিজে কখনও উত্তেজিত হয় না, বরং ছোট ছোট মন্তব্য করে চতুর্গুণ রাগিয়ে দেয় ভাইকে।

বাবার কথা কানে তুলল না তাতাই। গাঁক গাঁক চেঁচাচ্ছে, —স্টুপিডের মতো কথা বলিস না। নিজে কোনও দিন স্কুল টিমেও চান্স পাসনি, এদিকে

খেলার ব্যাপারে সব বুঝে গেছিস।

—একটু তো বুঝি। পাপাই গম্ভীর মুখে বাবার দিকে ঘুরল,—শুনলে, আমাকে স্টুপিড বলল?

সুপ্রতিম একটু কড়া গলায় ধমক দিল,—তাতাই, দাদার সঙ্গে যদি ভদ্রভাবে কথা না বলতে পারো, তা হলে এ সব তর্ক করবে না।

তাতাই ফোঁস ফোঁস করছে, —তা বলে ইডিয়টের মতো রিমার্ক করে যাবে? যে চোদ্দোটা টেস্ট খেলে আজ পর্যন্ত নিজেকে শো করতে পারল না...

—এবার ইডিয়ট বলল বাবা। আস্তে করে কথাটা ছুড়ে রুটিতে মন দিল পাপাই।

—কী হচ্ছে তাতাই, চুপ কর না। একটু শান্তিতে কথা বলতে দে। অদিতি মুরগির মাংসের বাটিটা তাতাই-এর দিকে এগিয়ে দিল,—কাদের সঙ্গে মিশিস? মুখের এরকম ভাষা হয়েছে?

তাতাই দাঁতে দাঁত ঘষে থেমে গেল। দাদার মতো কৌশলী ঝগড়ুটের সঙ্গে সে কোনও দিন পেরে ওঠে না। গাঁক গাঁক চেঁচায় ঠিকই, কিন্তু তাকেই ঢোক গিলতে হয় শেষমেশ। কত দিন যে রাগের মাথায় খাওয়া ছেড়ে উঠে গেছে তাতাই!

আজও তাতাই হাত গুটিয়ে বসেছে। অদিতি ছেলের চুল ঘেঁটে দিল,—খা, খা, খেয়ে নে।

সুপ্রতিম আড়চোখে তাতাইকে দেখে বলল,—থাক, ওকে আর অত আহ্লাদ দিতে হবে না। হ্যাঁ, কার কথা যেন বলছিলে?

সবাইকে খেতে দিয়ে নিজেও বসে গেছে অদিতি। একটু ঘুগনি মুখে তুলে বলল,—হেমেনমামা। আমার ছোটমামার বন্ধু। আমাদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে খুব আসত। লেখক।

পাপাই মুখ তুলেছে,—লেখক? পুরো নাম কী?

অদিতি এক সেকেন্ড ভেবে বলল,—হেমেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক।

—ওই নামে কোনও লেখক আছে বলে তো শুনিনি?

তাতাই ঝেঁজে উঠল,—তুই কি সব লেখকের নামও জেনে বসে আছিস? আমি হেমেন্দ্র কী যেন মল্লিকের তিনটে উপন্যাস পড়েছি।

—তুই! উপন্যাস! বাংলা! মা শুনছ...?

—আহ্ তাতাই। অদিতি ছোট ছেলের গরগরে ভাবটা থামাতে চাইল। সুপ্রতিমের দিকে ঘুরে বলল,—লেখক মানে সেরকম নামকরা কেউ নয়। এক সময়ে খুব লিখতটিখত। কবে যেন ছোটমামার ভবানীপুরের বাড়িতে গেছিল, সেখান থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে এসেছে।

—হঠাৎ তোমার কাছে কেন?

—এমনিই। তেমন কিছু কারণে নয়। অদিতি কুণ্ঠিত মুখে হাসল, —আমি এক সময়ে লিখতাম-টিখতাম তো, আমাকে খুব স্নেহ করত।

—তুমি লিখতে ? রাগ ভুলে তাতাই-এর চোখ বড় বড় ।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। স্কুল ম্যাগাজিনে আমার কত কবিতা বেরিয়েছে, কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প বেরিয়েছে, কলেজে আমাদের বাংলার টিচার অন্নপূর্ণাদি কী প্রশংসা করেছিল গল্পটার। বিশ্বাস না হয় তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।

—আমি ! আমি কী করে জানব ! সুপ্রতিম যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—বাজে কথা বোলো না। আমি নিজে তোমাকে বলেছি। বিয়ের পর পরই। শুধু আমি কেন, মা বলেছে, দাদা বলেছে...

—ও বিয়ের সময়ে মেয়েদের ওরকম অনেক গুণের কথা শোনা যায়, সব কিছু কি সত্যি বলে ধরে নিতে আছে ? ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সুপ্রতিম, —তোমার মা তো বিয়ের সময়ে বলেছিল তুমি নাকি দারুণ আমিষ রান্না করো, প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে মাংস রাঁধতে গিয়ে কী করেছিলে ? নুনেপোড়া ! ঘ্যাঁট ! নেহাত বাবা নতুন বউ-এর মুখ চেয়ে জলে ধুয়ে ধুয়ে খেয়ে নিয়েছিল।

অদিতি আহত মুখে বলল,—তুমি মাংস রান্নার সঙ্গে গল্প লেখার তুলনা করছ ?

—ওই হল। দুটোই মশলা-টশলা দিয়ে পাকাতে হয়। কোনওটা লোকে চিবিয়ে খায়, কোনওটা গেলে।

—তুমি তো বলবেই। একটা বই-এর পাতাও খুলে দেখেছ কখনও ? যারা এ-সব নিয়ে চর্চা করে তারা জানে গল্প লেখা কী কঠিন কাজ। জানো, হেমেনমামা আমাকে কি বলছিল আজ ? বলছিল তুমি এত ভাল লিখতে... লেখাটা একদম ছেড়েই দিলে ?

—অত আফসোস করার কী আছে ? লেখো না, কে বারণ করেছে।

—হ্যাঁ মা, একটা আত্মজীবনী লিখে ফেলো। এক গৃহবধূর স্মৃতিকথা। পাপাই ফুট কাটল, —শেষ করতে পারলে ছাপানোর বন্দোবস্ত করা যাবে।

তাতাই এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। চোখ টেরিয়ে তাকাল দাদার দিকে,—কে ছাপিয়ে দেবে ? তুই ?

—উঁহু। বাবা। মা-র একটা বই ছাপানোর জন্য তুমি আট দশ হাজার টাকা খরচ করতে পারবে না বাবা ? মা অবশ্য তোমার নামে বইতে অনেক ভাল ভাল কথা লিখে দেবে।

সুপ্রতিম হো হো হেসে উঠল,—মাত্র আট-দশ হাজার একটা ব্যাপার হল ? তোর মা শাড়ির ব্যবসা করতে গিয়ে আমার কত ধসিয়েছে ইম্যাজিন করতে পারিস ? ষোলো হাজার। সিক্সটিন থাউজ্যান্ড।

অদিতি ক্ষীণ প্রতিবাদ করল,—আমি তোমায় কিচ্ছু ফেরত দিইনি ?

মুরগির হাড় থেকে খুঁটে খুঁটে মাংস ছাড়াচ্ছে সুপ্রতিম। বলল,—দিয়েছ বলেই ষোল হাজার বললাম, নইলে কুড়ি বলতাম।

অদিতি একদম মিইয়ে গেল। সত্যি, মাঝে কী যে ভূত চেপেছিল মাথায়।

সময় কাটে না, ব্যবসা করব। সুপ্রতিমই মূলধন জোগাল। সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যদি দুটো পয়সা আসে মন্দ কী! ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে বড়বাজার থেকে পাইকারি দরে শাড়ি কিনে আনছে অদিতি, দাম ফেলে পরিচিতদের মধ্যে বেচছে। ইনস্টলমেন্টে। কুড়ি পারসেন্ট লাভ। তা ওই ব্যবসা কি অদিতিকে দিয়ে হয়! প্রথমেই ফস করে আসল দাম বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে, ঝুপঝাপ দাম কমিয়ে দেয়, তিনটে ইনস্টলমেন্ট শেষ পর্যন্ত ছ'টা আটটায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাও দাম চাইতে লজ্জা করে, নিজেকে কেমন কাবুলিওয়ালা কাবুলিওয়ালা মনে হয়। কিছু কিছু আত্মীয় তো রীতিমতো শাহেনশা। খুকু, তুই কিন্তু অনেক দিন আমাকে পুজোতে শাড়ি দিস না, এটা তোর নাম করে রেখে দিলাম! তুমি যেন কত পাবে বউদি, দেড়শো! সে কী, তিনশো কী করে হয়, গত মাসে আমি দেড়শো দিয়ে এলাম না! একটা একশো টাকার নোট, পাঁচটা দশ টাকার নোট! বছরখানেক পরে বউ-এর ব্যবসার হিসেব কষতে গিয়ে সুপ্রতিমের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। দুঁদে এরিয়া সেলস ম্যানেজারের বউ হয়ে অদিতি স্বামীর সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে! অদিতি বেচারি আর কী করে, কিছু শাড়ি দামে দামে ছেড়ে কিছু নিজেই পরে ব্যবসা গুটোল। এই বিল্ডিং কমপ্লেক্সেই কিছু না হলেও তিন-চার হাজার টাকা পড়ে আছে, সে কি আর উদ্ধার হবে!

অদিতি গুম হয়ে খাওয়া সারল। রাত্রে শোওয়ার আগে চুল বাঁধতে বাঁধতে তুলল কথাটা, —ছেলেদের সামনে আমাকে ওভাবে টাকার খোঁটা দিলে?

সুপ্রতিম ঘরে এসে খবরের কাগজের পাতায় ডুবে ছিল। খবরে নয়, শেয়ারের দরে। তামাম ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জ গেলা না হলে রাতে সুপ্রতিমের ঘুম আসে না। কোন শেয়ারের দাম পড়ছে, কোনটা চড়ল, প্রতিদিন তার হিসেব রাখা চাই। নেশা।

অদিতির কথা যেন কানে গেল না সুপ্রতিমের। অদিতি আবার বলল, —ছেলেদের সামনে আমাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করে তোমার কী লাভ হয়?

তরলভাবে এবার উত্তর দিয়েছে সুপ্রতিম, —হলটা কী? গজগজ করছ কেন?

অদিতির চোখে জল এসে গেল, —তুমি আমাকে ছেলেদের সামনে মিথ্যেবাদী পর্যন্ত বললে!

—যাহ্ বাবা, মিথ্যেবাদী কখন বললাম?

—বলোনি? বুকে হাত দিয়ে বলো, আমি তোমাকে আমার লেখার কথা বলিনি কোনওদিন? নিজে তুমি তখন বলেছিলে ও বাড়ি থেকে আমার ম্যাগাজিনগুলো এনে পড়বে..!

—ও, এই জন্য গোঁসা! সুপ্রতিম গাল ছড়িয়ে হাসল। খেপাচ্ছে অদিতিকে, —আমি মোটেই ও কথা বলিনি। খালি বলেছি তুমি যে লিখতে এটা আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি।

—সেটাও তো কোনওদিন বলোনি !

—কী বলিনি ?

—যে আমার কথা বিশ্বাস হয়নি !

সুপ্রতিম মুচকি হাসল, —নতুন বউকে এ কথা কেউ বলে ? তুমি যদি তখন বলতে ঘোড়া চালাতে পারি, পাহাড়ে চড়তে পারি, সে কথারও আমি থোড়াই প্রতিবাদ করতাম।

—তোমার পেটে পেটে এত প্যাঁচ ছিল ?

—প্যাঁচ নয়, সেলফ্ ডিফেন্স। কে আর নতুন বউ-এর মুখ ভার দেখতে চায় !

অদিতি কথা বলল না। নাকের পাটা ফুলিয়ে জোর জোর চিরুনি চালাচ্ছে চুলে। এখনও তার চুল বেশ লম্বা, কেশচর্চায় সময় যায় তার। ফিতের এক পাশ দাঁতে চেপে অনেকক্ষণ ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চুলের গোড়া বাঁধল। দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আলগা চুল বড় পিছলে যায় বালিশে, অদিতির অস্বস্তি হয়।

বিনুনি শেষ হতে হতে অভিমানটা কমে এল অদিতির। তার রাগ ক্ষোভ অভিমান সবই শরতের মেঘের মতো ক্ষণস্থায়ী। এই বৃষ্টি, এই রোদ্দুর।

চিরুনি থেকে চুল ছাড়িয়ে অদিতি উঠে গেল জানলায়। উড়িয়ে দিচ্ছে চুল। জানলা থেকেই বলল, —হেমেনমামার চেহারাটা দেখে আজ খুব মায়া হল।

—খুব মায়াবী চেহারা হয়েছে নাকি ?

অদিতি হেসে ফেলল। সুপ্রতিম বড্ড ফাজিল। পঞ্চাশ বছর বয়স হতে চলল, ফক্কুড়ি কমল না। হাসতে হাসতে বলল, —নাগো, কী ছিল, কী হয়েছে ! প্রথম যেদিন ছোটমামার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল, আমি তো একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কতই বা তখন বয়স হবে ? সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। আমিই তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। কী দেখতে ছিল তখন হেমেনমামা ! লম্বা চাবুকের মতো শরীর, টকটকে রঙ, খাঁটি গ্রিকদের মতো নাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা... লেখক বলতে যে চেহারা মনে আসে ঠিক সেইরকম। এখন একদম ঝিরকুটি মেরে গেছে।

—মন খারাপ লাগছে ?

—লাগারই তো কথা। অত সুন্দর চেহারা, ওরকম বুড়োটে মেরে গেলে...

সুপ্রতিম খুচখাচ পেনসিল চালাচ্ছিল কাগজে। গোল করে দাগ টানছিল। থামল। চালশে চশমা খুলে দোলাচ্ছে।

—প্রেমে পড়েছিলে মনে হচ্ছে ?

—পড়লে তো ভালই হত। অদিতি ছদ্ম শ্বাস ফেলল, —লোকটার একটা হিল্লে হত।

—মানে ? বিয়ে করেননি ?

—না। সাহিত্যপাগল লোক, ওই নিয়েই থাকত। কী একটা কাগজ বার করত যেন। ছোটখাটো কাগজ। তারপর হঠাৎ একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে আলিপুরদুয়ার চলে গিয়েছিল।

—হাফসোল কেস নাকি ? কলকাতা ছেড়ে একেবারে আলিপুরদুয়ার ?

—হতে পারে। আমারও তাই ধারণা।

—মেয়েটি কে ? তুমি নও তো ?

—যাহ্, কী যে বলো না ! আমার থেকে কত বড়...। মামার বন্ধু, সে তো মামাই।

—সাউথ ইন্ডিয়াতে মামা-ভাগ্নি কিন্তু খুব রোমান্টিক রিলেশান। সুপ্রতিম লম্বা আড়মোড়া ভাঙল, —এমন তো হতে পারে, ভদ্রলোক তোমার নীরব প্রেমিক ছিলেন ! না হলে অ্যাদ্দিন পর খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এলেন কেন ?

—মোটেই না। বললাম তো আমার লেখা হেমেনমামার খুব ভাল লাগত। অদিতি বিছানায় এসে বসল, —হেমেনমামা কলকাতায় ফিরে আবার কাগজ বার করছে। আমাকে সেখানে লিখতে বলছিল।

—বাহ্, ভালই তো। লেখো। কি লিখবে ? কবিতা, না গল্প ?

—দুর, এই বয়সে আর লেখা হয় নাকি !

—কেন হবে না ? যা পারবে লিখবে, উনি তো ছাপিয়ে দেবেন। সুপ্রতিম সিগারেট ধরিয়েছে। টানছে আয়েশ করে,—নিজেই তো বলো সময় কাটে না। কাটাও সময়। নাকি তাতেও আলস্য ? এত কুঁড়ে কেন ?

সুপ্রতিমের এই টিপ্পনিটা অদিতিকে বেঁধে খুব। অদিতি কুঁড়ে। বিয়ের পর থেকে কিভাবে দিন কেটেছে অদিতির, সুপ্রতিম কি জানে না ? শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে, দেওর ননদদের কলেজ ইউনিভার্সিটির ভাত জুগিয়ে, দুই দস্যি ছেলের পিছনে চরকি কেটে কতটুকু সময় থাকত অদিতির হাতে ? ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিমের পদোন্নতি হল, দেওর ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেল লখনউ, দুই ননদের একে একে বিয়ে হয়ে গেল, এক বছরের তফাতে শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই গত হলেন, নতুন ফ্ল্যাট কিনে সেলিমপুরে উঠে এল অদিতিরা, তাতেও কি অবসর মিলেছিল ? পাপাই তাতাই-এর পড়াশুনো নিয়ে কোনওদিন এতটুকু ভাবতে হয়নি সুপ্রতিমকে, সে শুধু সংসারে টাকা দিয়েই খালাস। আগে অফিসই তার ধ্যানজ্ঞান ছিল, এখনও অফিসই তার কাশী বৃন্দাবন। তফাতের মধ্যে তফাত, তখন ছুটত মালদা মুর্শিদাবাদ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, এখন ওড়ে ভুবনেশ্বর, পাটনা, রাঁচি গৌহাটি, কটক। আর মাঝে মাঝেই তার স্বর্গধাম—মুম্বাই হেডঅফিস। এরই মধ্যে দুই ছেলে মাধ্যমিক করল, উচ্চমাধ্যমিক করল, দেখতে দেখতে ঢুকে গেল কলেজে, কোনওটাই এলেবেলে ভাবে নয়, রীতিমত দাপিয়ে-দুপিয়ে, এত কিছু তো আর হাওয়ায় ভেসে ভেসে হয়নি ! নিত্যি ছেলেদের স্কুলে ছোটা, এর টিউটোরিয়াল খোঁজা, ওর মাস্টার

ঠিক করা, কে কোন সাবজেক্টে পিছিয়ে পড়ছে তার হদিশ রাখা, ভোরে পাপাই-এর ক্রিকেট প্র্যাকটিস তো বিকেলে তাতাই-এর সাঁতার ক্লাব, দুই ছেলের অবিরাম বায়না আবদার—এ-সব তো আদিতি কুঁড়েমি করেই সেরেছে কিনা ! পাপাই যদি এ কাঁধ ধরে ঝোলে, তো তাতাই লাফায় অন্য কাঁধে। হিমশিম দশা। এর সঙ্গে বাজারহাট, সংবৎসরের হরেকরকম কেনাকাটা, লোকলৌকিকতা। পায়খানা পরিষ্কার করার অ্যাসিড কেনা থেকে শুরু করে সুপ্রতিমের টাই বাছা, সব একা হাতে করতে হয়েছে অদিতিকে।

আজ সুপ্রতিম বলে অদিতি কুঁড়ে !

হ্যাঁ, এখন অদিতির সময় অঢেল। দুপুর বিকেল সন্ধে অনেকটাই এখন হাতের মুঠোয়। ছেলেরা আর গায়ে লেপটে থাকে না। অদিতির অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশনের পর থেকে দু বেলা রান্নার লোক রাখা হয়েছে। পাপাই অল্পস্বল্প বাজারহাট করে দেয়। আর সুপ্রতিম তো নটার আগে বাড়িই ফেরে না। ফাঁকা ফ্ল্যাটে অদিতির তো এখন সময়ই সময়।

সময় আছে। সময় চলেও গেছে।

যে যায়, সে তো চলেই যায়। নদীর এক জলে কি দ্বিতীয়বার স্নান করতে পারে মানুষ ? এই বয়সে লেখার কথা ভেবে লোক হাসিয়ে লাভ কী ? তার চেয়ে বোধহয় কুঁড়েমির অপবাদ শোনা ঢের ভাল।

অদিতি ছোট্ট শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। রাত্রে গলাটা বার বার শুকিয়ে যায়, ঘরে জল এনে রাখতে হবে।

সুপ্রতিম অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাচ্ছে। ডাকল অদিতিকে, —এই, টেবিল থেকে আমার ফাইলটা দাও তো।

—তুমি এখন শোবে না ? কাজ নিয়ে বসবে ?

—না না, দেখব একটু। এই পাঁচ দশ মিনিট।

ফাইল দিয়ে অদিতি রান্নাঘরে এল। গ্যাসের ওপর গরম দুধ রেখে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা হয়েছে, এবার ফ্রিজে তুলতে হবে। কম্পাউন্ডে আজকাল প্রায় রাতেই চোর আসছে, পরশুদিনও রেনপাইপ বেয়ে পাশের ফ্ল্যাটে উঠেছিল। চোররা একটু জিপসি ধরনের হয়, এক পাড়ায় তারা বেশিকাল ঘাঁটি গাড়ে না। তবু সাবধানের মার নেই, রান্নাঘরের জানলা ভেতর থেকে ভাল করে দড়ি বেঁধে বন্ধ করল অদিতি। দশ বছর হল ফ্ল্যাটে এসেছে, এর মধ্যে একবার মাত্র কলি ফেরানো হয়েছে, তাও প্রায় চার বছর আগে। রান্নাঘরের দেওয়ালের অবস্থা বেশ খারাপ, এই শীতেই বাড়িটা রঙ করাতে হবে। রান্নাঘরে কি আরও ফুটখানেক টাইলস লাগিয়ে নেবে ? নিলে হয়।

বাথরুম সেরে, জলের জগ হাতে ঘরে ফিরছিল অদিতি, অভ্যেসবশে ছেলেদের ঘরে উঁকি দিল একবার। বড় আলো নেবানো, তাতাই নিজের খাটে ঘুমোচ্ছে। রেগে থাকলে বেশি রাত অবধি টিভি দেখে না তাতাই, ফোলা মুখে ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলেমানুষ। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে পড়াশুনো করছে পাপাই।

দিনের বেলা পাপাই বই ছোঁয় না, রাতই তার পড়ার সময়। জেগে থাকতেও পারে বটে। একটাই শুধু অনুষঙ্গ প্রয়োজন। কফি। হায়ার সেকেন্ডারির সময় থেকে ধরেছে নেশাটা। ছেলে চাইলেও অদিতি অবশ্য এখনও খুব কড়া কফি দেয় না পাপাইকে, বেশি করে দুধ দিয়ে দু আড়াই কাপ মতন ফ্লাস্কে ভরে দেয়। কফি তাও ভাল, ভাগ্যিস তাতাই-এর মতো সিগারেটের নেশা হয়নি! ওইটুকুনি পুচকে তাতাই-এর গা দিয়ে কী ভুক ভুক তামাকের গন্ধ বেরোয়! সুপ্রতিম শুনে বলেছিল, আমি ওই বয়সে বিড়ি খেতাম! হুঁহ্, বাপ কা বেটা।

অদিতি ঘরে এল।

এক ঢোক জল খেয়ে ড্রেসিংটেবিলে জগ রাখল অদিতি, পাখাটা দু পয়েন্ট কমিয়ে দিল। ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে আজকাল, পাখার হাওয়ায় শীত শীত করে। এ ঘরের দুটো জানলাই উত্তরমুখী, তাই শীতলতাও বেশি। ঠাণ্ডার সময় দিনদুপুরে হাড় কাঁপে।

মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছে সুপ্রতিম। ঠিক শোয়ওনি, আধশোওয়া, ফাইল পড়ছে।

অদিতি অপ্রসন্ন মুখে বিছানার ভেতরটা দেখল, —আজও তুমি সুজনি দুটো নাওনি ?

—সরি। ভুলে গেছি।

—এত ভুলো মন কেন ? মশারি টাঙানো, আর বিছানায় বালিশ চাদর নেওয়া, এই দুটোই তো তোমার কাজের মধ্যে কাজ। তাতেও রোজ ভুল ?

—বলছি তো সরি। নিয়ে নাও না। সুপ্রতিম চশমা মাথার পিছনে রাখল। ফাইলটাও। হাই তুলতে তুলতে বলল, —আমার অত সুজনি ফুজনি লাগে না। তোমারই শীত বেশি।

—তাইই তো। ভোরবেলা আমিই খকখক কাশি কিনা! বাক্স খাটের গহ্বর খুলে সুজনি বার করল অদিতি, আলতো ঢুকিয়ে দিল বিছানায়।

আশপাশে কোথাও টিভি চলছে, বোধহয় কেবল্ টিভির সিনেমা। শব্দটা চাপা কোলাহলের মতো ভেসে আসছে ঘরে। কোনও ফ্ল্যাটে ঝনঝন বাসন পড়ল, কোথাও কেউ একটা চিৎকার করল হঠাৎ, বাঁকের মুখে এসে শিয়ালদাগামী শেষ লোকাল ট্রেন তীক্ষ্ণ হুইসিল্ বাজাচ্ছে, সমস্ত শব্দই বড় জ্যান্ত লাগে এ সময়ে।

অদিতি বিছানায় এল। মশারির চালে রাখা বেডসুইচ টিপে অন্ধকার করল ঘর।

সুপ্রতিম চিত হয়ে শুয়েছে। বলল, —গোলমালে কথাটা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। আমার একটা ভাল নিউজ আছে।

—কী ?

—সামনের মাস থেকে আর শেয়ার ট্যাক্সির ধান্দা করতে হবে না, অফিস গাড়ি দিচ্ছে।

—তাই ?

—ইয়েস। অবশ্য আমার একার জন্য নয়। যাদবপুরে অ্যাকাউন্ট্স-এর সেন আছে, ও আর আমি যাব। অফিসে গাড়িটা টোটালি আমার কনট্রোলে থাকবে।

—হুঁ।

—হুঁ হুঁ করছ কেন ? মানেটা বুঝছ ? কোম্পানিতে আমার ইম্পর্টেন্স বাড়ছে। যদ্দূর আমার কাছে খবর আছে মুম্বই অফিস ইজ টেকিং অ্যাকটিভ ইন্টারেস্ট অন সুপ্রতিম মজুমদার। একটা বড় পে-হাইক হতে পারে।

—ভাল তো।

—ভাল, কিন্তু প্রবলেমও আছে। শুনছি জেমসন ইন্ডিয়া নাকি আমাদের সঙ্গে অ্যামালগামেট করে যাবে। নামেই অ্যামালগামেশান, ওদের যা ক্যাপিটাল, গিলেই নেবে আমাদের। এমনি কিছু না, মাইনে পত্তর পার্কস ফার্কস নিয়ে প্রবলেম নেই, তবে মাথার ওপর একগাদা আন্‌নোন্‌ লোক এসে যাবে... পঁচিশ বছর চাকরি করছি, এখন কি আর উটকো লোকের দাপট ভাল লাগবে ? ...আমার একটা ওয়ার্কিং প্যাটার্ন আছে, সে সব যদি তাদের পছন্দ না হয়...

এ সব কথা মনোযোগ দিয়েই শোনে অদিতি। তার স্বামী একজন কর্মঠ মানুষ, খেটে খেটে উঁচুতে উঠেছে, ফাঁকিবাজি স্বভাব নেই, কোম্পানিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, চোর জোচ্চোর ঘুষখোর লোভী নয়, এমন লোকের কাজকর্মের গল্পে স্ত্রীর আগ্রহ থাকাটাই তো স্বাভাবিক। সুপ্রতিমের চোখ দিয়ে ভিন্ন স্বাদের বৃহত্তর পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া, এই বা কি কম প্রাপ্তি অদিতির ?

শুনতে শুনতে অদিতি ডুবতে থাকে সুখের নিদ্রায়। ঘুমপাড়ানিয়া গানের মতো কথা বলে যেতে থাকে সুপ্রতিম। একাই। সেলস লাইনে চাকরি করার সব থেকে বড় সুবিধে তার কথা কেউ শুনছে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হয় না। কথা বেচেই খাওয়া। কথা বলেই সুখ। কথা শুনিয়েই ঘুম।

আজও ঘুমিয়ে পড়েছিল অদিতি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। ব্যালকনিতে পাখিটা ভীষণভাবে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

অদিতি সুপ্রতিমকে ঠেলল, —এই, কার্নিশে বেড়াল এসেছে বোধহয়। একটু দ্যাখো না।

সুপ্রতিমেরও চোখে তন্দ্রা এসেছিল। বিরক্ত-মুখে বলল, —একটু ঝাপটাক ডানা। আমাদের গ্রিল দিয়ে বেড়াল ঢুকতে পারবে না।

অদিতি আলো জ্বালাল, —নাগো, পাখিটা খুব ভয় পাচ্ছে। যাও না একটু, বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এসো।

—আমি পারব না। তোমার পাখি, তুমিই যাও।

—প্লিজ যাও। আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না।

—জ্বালালে। দুম দুম করে বিছানা থেকে উঠে গেল সুপ্রতিম। একটু পরেই ফিরে এসেছে। পাখিটাও নীরব।

অদিতি কোমর অবধি সুজনি টেনে নিল, —বেড়াল এসেছিল, না ?

—দ্যুৎ, সেই কোন ওদিকের পাঁচিলে বসে আছে. পাখিটা তোমার একেবারে রাম বোকা।

—এখনও আছে বেড়ালটা ? তা হলে তো আবার এক্ষুনি ডানা ঝাপটাবে !

—আর ঝাপটাবে না। খাঁচাটাকেই চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ও ব্যাটা বেড়ালটাকে আর দেখতেই পাবে না।

সুপ্রতিম আলো নিভিয়ে দিল।

॥ তিন ॥

নিস্তরঙ্গ পুকুরে এক কুচি ঢিল পড়লেও তরঙ্গ ওঠে বইকী। তবে সেই তরঙ্গের স্থায়িত্ব আর কতটুকু ? দশ সেকেন্ড, বিশ সেকেন্ড, বড় জোর এক মিনিট ! এ তরঙ্গ বড় মৃদু, শক্তিহীন। দুর্বল বৃত্তাকার ঢেউ হয়তো একসময়ে কাঁপতে কাঁপতে পাড়ে এসে পৌঁছয়, কিন্তু তখন তার অস্তিত্বই অনুভব করা কঠিন। স্থির পুকুরের দিকে তাকিয়ে কে তখন বলবে, একটু আগে ঢিল পড়েছিল এখানে !

হেমেনমামা নামক মানুষটিরও চকিত আগমন অদিতির কাছে অনেকটা এই গোত্রেরই ঘটনা। ছোট্ট এক সুখস্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে অদিতির মনোজগতে ক্ষীণ আলোড়ন জাগিয়েছিল হেমেনমামা, ক্ষণকাল অদিতির চিত্ত উদ্বেল রইল তাতে, তারপর আবার সব স্বাভাবিক। সংসারের পাড়ে অচিরেই হারিয়ে গেল তরঙ্গ, কোনও অভিঘাতই সৃষ্টি করতে পাবল না।

অদিতিও নিশ্চিন্ত। খাঁচার পাখির সঙ্গে সময় কাটছে তার, স্বামী ছেলেদের ভাবনা ভেবে দিন যাচ্ছে তার, সময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পার করছে সময়।

অথবা সময় কাটছে না।

তাতেই বা অদিতির কী এল গেল ? সময় তো আর সত্যি সত্যি নিশ্চল অনড় এক পাহাড় নয়, যেমন ভাবেই হোক সে ঠিক গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাবে।

যাচ্ছেও তো। সুপ্রতিম গত সপ্তাহে তিনদিনের জন্য গৌহাটি ঘুরে এল, এই শনি রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় উইকএন্ড কাটিয়ে এল তাতাই, পড়াশুনো নিয়ে আরও বেশি রাত জাগা শুরু হয়েছে পাপাই-এর। এও তো অদিতির দিন কাটা।

আলমারি খুলে শাড়ি বাছছিল অদিতি। হ্যাঙারে সার সার শাড়ি ঝুলছে, সবই দামি। কাঞ্জিভরম্ ঢাকাই কলাক্ষেত্রম্ বালুচরী বমকাই চান্দেরি। অদিতির পুজোর শাড়ি নিজে পছন্দ করে কেনে সুপ্রতিম, সেই বিয়ের পর

থেকেই। বেশিরভাগই চড়া রঙ-এর। ঘোরতর রঙিন না হলে সুপ্রতিমের মনে হয় বুঝি ঠকা হল দামে।

বাসন্তী রঙ কাঞ্জিভরমটা বার করে উল্টেপাল্টে দেখল অদিতি। নাহ্, এটা পরে যাবে না, একটু নোংরা হয়ে আছে। ছোট ননদের দেওরের বিয়েতে শেষ পরেছিল শাড়িটা, শ্রাবণে। তারপর আর কাচানো হয়নি। এত শাড়ির কটাই বা পরা হয় অদিতির ! তবু কেনা হয়, তবু ঝোলে। ঘেঁটে ঘেঁটে অদিতি এবার একটা বম্‌কাই সিল্ক বার করল। এ শাড়িটারও রঙ বেশ চড়া, তুঁতে নীল। ছেলেরা বড় হয়েছে, এত গাঢ় রঙ আর পরতে ভাল লাগে না অদিতির। কিন্তু উপায় নেই। সুপ্রতিম আর অদিতির মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ির কোন অনুষ্ঠানে অদিতি নিজের পছন্দমতো শাড়ি পরতে পারে কিন্তু সুপ্রতিমের বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেলে সুপ্রতিমের পছন্দের শাড়ি পরতে হবে অদিতিকে। থাক, এটাই থাক তবে। এই শাড়িটার রঙ তাও চোখে একটু কম লাগে।

শাড়ি ব্লাউজটায় হালকা ইস্ত্রি চালাতে চালাতে তাতাই-এর গলা পেল অদিতি। বাড়ি ফিরেই হুকুম জারি শুরু করেছে, —সবিতাদি, আমাকে শিগগিরই কিছু খেতে দাও। এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে।

অদিতি দরজায় গেল, —এক্ষুনি তো ঢুকলি, এই সন্ধেবেলা আবার কোথায় বেরোবি ?

—কাজ আছে মা।

—কী কাজ ?

—আছে।

তাতাই হেলেদুলে নিজেদের ঘরে ঢুকছে, অদিতি পিছন পিছন এল, —তোর ব্যাপার কী বল তো ? সারাদিনে তো কখনও তোকে বই খুলতে দেখি না ?

তাতাই সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতের চেটোয় মাথা রেখে ফুঃ ফুঃ শব্দ করছে মুখে। মাকে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, —কে বলেছে পড়ি না ? আমি ভোরবেলা পড়ি।

—বাজে কথা বলিস না। উঠিসই তো সাতটার পর।

—তা হলে তখনই পড়ি।

—ফের বাজে কথা ? উঠে তুই কী করিস আমি দেখি না ? এক ঘণ্টা ধরে খবরের কাগজ চটকাস, তারপর টুক করে কোথায় বেরিয়ে গেলি, তারপর ফিরে এসেই হুড়ুদ্দুম করে কলেজ। ...এর মধ্যে তুই পড়িসটা কখন ?

তাতাই উত্তর দিল না। চোখ বুজে রয়েছে।

তাতাইটা চিরকালই এরকম। মহা ফাঁকিবাজ। জোর করে ধরে বেঁধে পড়াতে না বসালে পড়তই না। কম মার খেয়েছে অদিতির হাতে ! স্কুল পালিয়ে সিনেমা যেত। টিউটোরিয়ালে ডুব মারত। নজর না রাখলেই বিপত্তি। অথচ আশ্চর্য, তাতাই রেজাল্ট কিন্তু খারাপ করেনি কখনও।

পাপাই-এর মতো অত ভাল না হলেও মাধ্যমিকে স্টার, উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশান। উচ্চমাধ্যমিকের পর সায়েন্স ছেড়ে কমার্সে চলে গেল। জেদ করে। গ্র্যাজুয়েশানটাও কি এ-ভাবে পার হবে তাতাই ? তারপর ?

অদিতি পায়ে পায়ে ছেলের কাছে এল, —হ্যাঁ রে, তোর দাদাকে দেখেও একটু শিখতে ইচ্ছে করে না ?

তাতাই তড়াং করে উঠে বসেছে, —প্লিজ মা, কতদিন বলেছি দাদার সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। ও তো একটা বুকওয়ার্ম। পড়া, লাইব্রেরি, নোটস, স্যার এ ছাড়া ওর কোনও জগত আছে ? আমি ওর মতো হতে চাই না।

দুই ভাই-এ যে আকাশপাতাল তফাত এ সত্যটা বহুকাল আগেই টের পেয়েছে অদিতি। শুধু পড়াশুনো কেন, কোন্ বিষয়েই বা দুজনের মিল ? পাপাই-এর টেবিল বইখাতা জামাকাপড় খাটবিছানা নিখুঁত গোছানো, তাতাই-এর সবই চূড়ান্ত এলোমেলো। আগে আগে অদিতি নিজের হাতে পরিষ্কার করত এ ঘর, এখন অদিতি ছুঁলেই নাকি তাতাই আর দরকারি জিনিস খুঁজে পায় না !

অদিতি ছেলের খাটে বসল, —কার মতো হতে চাস তুই ?

সবিতা পরোটা তরকারি দিয়ে গেছে, দ্রুত গিলছে তাতাই। গাল ভরতি খাবার নিয়ে বলল, —আমি আমার মতোই হতে চাই মা। দুনিয়ায় এক পিসই তাতাই থাকবে।

—সে তো তুমি এখনই আছ।

তাতাই ঢকঢক জল খেল খানিকটা, —তুমি আজ আমার পেছনে পড়লে কেন বলো তো ? তোমার আজ একটা নেমন্তন্ন আছে না ?

—কথা ঘোরাস না তাতাই। জীবনের সব পরীক্ষায় স্টেজে বাজিমাৎ হয় না।

অদিতির আঁচলে মুখ মুছে নিল তাতাই, —আজ রূপককাকুর ম্যারেজ অ্যানিভারসারি না ? বাবা সেদিন বলছিল গ্যালা টুয়েন্টিফাইভ ইয়ারস...

ছেলের কায়দায় অন্যদিন হেসে ফেলত অদিতি, আজ একটু রুক্ষই হয়ে গেল, —অনেকদিন আমার হাতে কিন্তু মার খাসনি তাতাই। কোথায় টো-টো করিস দিনরাত ? কলেজ টলেজ যাস ?

—তোমার খোচড়কে পাঠিয়ে খবর নিয়ে নিয়ো। চোখের ইশারায় দাদার খাটটা দেখাল তাতাই। হাসছে, —বাবা কখন আসবে বলেছে ? ছটা ? বলেই তাতাই ঘড়ি দেখল একবার—এখন কিন্তু পৌনে সাতটা বাজে। বাবা ঠিক সাড়ে সাতটায় ঢুকবে। এখন থেকে সাজগোজে বসে না গেলে ম্যানেজ করতে পারবে না।

তাতাই উঠে পড়ল। বেরোচ্ছে। অদিতিকে আমল না দিয়েই। ফ্ল্যাটের দরজা অবধি গিয়েও ফিরে এল। দু হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, —তোমাদের ফ্লাওয়ার বোকে টোকে লাগবে না ? টাকা দাও তো এনে দিতে পারি।

—থাক। যেখানে চরতে যাচ্ছ যাও।

তাতাই দাঁড়িয়েই আছে। গাল চুলকোচ্ছে, —তা এমনিই কিছু দাও না। খুব বেশি নয়, গোটা পঞ্চাশ।

অদিতি কঠোর চোখে ছেলের দিকে তাকাল। পরশুই পঞ্চাশ টাকা নিয়েছিল তাতাই, আজ আবার চাইছে, কী করছে টাকা নিয়ে ? শুধু সিগারেটে তো এত টাকা লাগে না ?

মায়ের চোখ দেখে দু হাত তুলে দিয়েছে তাতাই, —ওকে। লাগবে না। ভুরুটা সোজা করে নাও। নইলে রূপককাকুর বাড়িতে বাবার বদনাম হবে।

তাতাই চলে গেল।

ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসেও তাতাইকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল অদিতির। ছোট ছেলেটার বিপদের দিকে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ক্লাস ফোরে পড়ার সময়ে সাঁতার শেখার জন্য খুব আবদার জুড়েছিল তাতাই, দুরন্ত ছেলেকে জলে ছাড়তে অদিতি রাজি হয়নি প্রথমে। বলেছিল, তুমিও দাদার সঙ্গে ক্রিকেট প্র্যাকটিসে যাবে। উঁহু, সাঁতারই শিখবে সে। কদিন মার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করার পর ওইটুকু ছেলে একদিন একা একাই চলে গেছে লেকে। এমন সেয়ানা, বন্ধুকে দিয়ে খবরটা পাঠিয়েও দিয়েছে বাড়িতে। অদিতি হাঁচোড়-পাচোড় করে ছুটে গিয়ে দেখে পাবলিক সুইমিং পুলে হাত পা ছুড়ছে তাতাই। জল খাচ্ছে মাঝে মাঝে, তবু মাকে দেখে কী হাসি ! হিড়হিড় করে বাড়ি নিয়ে এসে ছেলেকে খুব পিটিয়েছিল অদিতি, পরদিন ভরতিও করে দিয়েছিল সাঁতার ক্লাবে। একবার তো, এই বছর দু-এক আগে, বন্ধুর দাদার মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে হাত পা ফালা ফালা করে এল। আবার কোনও বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠছে না তো তাতাই ?

বলে না। কিছুই বলে না। পাপাই তো বহুদিনই চুপচাপ, তাতাইও এড়িয়ে চলছে ! আগে তাও ছেলেদের ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো বুঝতে পারত অদিতি, এখন ছেলেরা তার চেনা না অচেনা এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে অনুক্ষণ। যদি কখনও মানুষ আবিষ্কার করতে থাকে তারই শরীরের অংশ একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সেই বিচ্ছিন্ন অংশদের হাত পা মুখ গজাচ্ছে ধীরে ধীরে, আলাদাভাবে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে তারা, তখন যে ঠিক কী অনুভূতি হয় !

অন্যমনস্ক মুখে সাজগোজ সারল অদিতি। খুব একটা প্রসাধন সে কোনওদিনই করে না। মুখে একটু হালকা ক্রিম কিংবা ফেসপাউডার, চোখে সামান্য কাজল, ছোট টিপ, আলতো লিপস্টিক, কিছু ছোটখাটো গয়না, এইটুকুই। তার চেহারাটা আগে বেশ ছিপছিপে ছিল, ইদানীং মেদ জমছে শরীরে, অপারেশনের পর থেকে শরীরটা যেন একটু ভারীই হয়ে গেল। তবে তার মুখ থেকে যৌবনের কমনীয়তা পুরোপুরি মুছে যায়নি। এক ঢাল কালো চুলে, ফর্সা ভরাট মুখে অদিতি এখনও দীপ্তিময়ী। সুপ্রতিমের বন্ধুমহলে অদিতির রূপের খ্যাতিতে ভাঁটা পড়েনি এখনও।

সুপ্রতিম এল ঠিক সাড়ে সাতটায়। যেন তাতাই-এর কথা শুনেই। এসেই হাঁক ডাক শুরু করে দিল, যেমনটি এ ধরনের পার্টিতে যাওয়ার আগে সে করেই থাকে। একী, আমার জন্য ক্রিম কালারের পাঞ্জাবি বার করেছ কেন, এটা নয়, তসরের সেটটা দাও। দেখি দেখি তোমার মুখটা দেখি, টিপটা একটু বড় পরতে পারতে। আমার ইলেকট্রিক রেজারটা পাপাই-এর ঘরে আছে বোধহয়, বসে রইলে কেন, দেখো না। ওফ্, তোমার কোনও সেন্স নেই, এই পাঞ্জাবির সঙ্গে আমি ওই জ্যাকেট পরব! আর একটু লিপস্টিক লাগিয়ে নাও, মুখটা ম্যাড়ম্যাড় করছে। কেমন হয়েছে বোকেটা বললে না তো! নিউমার্কেট থেকে করিয়ে আনলাম! টু থারটি! শালা আমাকে তিনশো বলছিল!

বেরনোর সময়ে মনটা খুঁতখুঁত করছিল অদিতির। সবিতা রান্না করে চলে গেছে, পাপাই ফেরেনি. মিনিট পাঁচ দশ আরও দেখে গেলে হত। কিন্তু সুপ্রতিম যা তাড়া লাগাচ্ছে! কোথাও যাওয়ার থাকলে সুপ্রতিম কখনই সময়ে বাড়ি ফেরে না, কিন্তু একবার বাড়ি এলে এক মিনিটও তর সয় না তার। অগত্যা পাশের ফ্ল্যাটে চাবি রেখেই বেরিয়ে পড়তে হল অদিতিকে।

রূপকদের বাড়ি বেশ দূর। বেহালা চৌরাস্তা পেরিয়ে। ট্যাক্সিতে প্রায় মিনিট কুড়ি লাগে। মহাবীরতলায় এ সময়টায় ট্রাফিক জ্যাম থাকে, আর একটু বেশিও লাগতে পারে।

রাত্রি গাঢ় হচ্ছে। কাল থেকে ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে একটা, কামড় আছে হাওয়াটায়। মাঝ-অঘ্রানে এই হাল, শীত বোধহয় এবার জাঁকিয়ে আসবে।

ট্যাক্সির একটা কাচ খানিকটা উঠিয়ে দিল অদিতি, গলায় আলতো আঁচল জড়াল। সুপ্রতিম সিটে হেলান দিয়ে বসে, গানের কলি ভাঁজছে গুনগুন।

অদিতি বলল, —কায়দা করে জ্যাকেট না পরে গরম কিছু একটা পরতে পারতে।

—ছাড়ো তো, একি আবার ঠাণ্ডা নাকি? ঠাণ্ডা ছিল গৌহাটিতে। ...ফিরবার সময়ে তো গরম হয়েই ফিরব।

অদিতি মুখ ফিরিয়ে নিল। তাতাইটা একটা পাতলা টিশার্ট পরে বেরিয়ে গেল, ঠাণ্ডা না লাগে। বাচ্চাবেলায় খুব সর্দির ধাত ছিল তাতাই-এর, গোটা শীতটা ভুগত। সাঁতার কেটে কমেছিল অনেকটা। মাধ্যমিকের পর থেকে আর সাঁতারে যাচ্ছে না তাতাই, ভোগান্তিও শুরু হয়ে গেছে। সিগারেট কটা করে খায় কে জানে!

আনমনে অদিতি বলল, —কোনওদিন তো সংসারের দিকে দেখলে না, ছোট ছেলেটার দিকে নজর করেছ?

ফুলের তোড়া পাশে রেখে সিগারেট ধরিয়েছে সুপ্রতিম, বলল, —কেন, তার আবার কী হল?

—হবে আবার কী। বড্ড ডোন্ট কেয়ার ভাব এসে গেছে।

—এই বয়সে ওরকম হয়। জোশ্। নতুন পাখনা গজাচ্ছে...। সুপ্রতিম টোকা দিয়ে দেশলাই কাঠি বাইরে ফেলল।

অদিতি একটু ভাবল। ছেলেদের নিয়ে সুপ্রতিমের সঙ্গে সে সচরাচর আলোচনা করে না, এটা তার নিজস্ব এলাকা।

তবু আজ চুপ থাকতে পারল না। বলল,—আমার তাতাই-এর সঙ্গীসাথীদের একটুও পছন্দ নয়।

—ওর তো চিরকালই সব রকম বন্ধু আছে। ভাল। খারাপ।...দু'-চারটে খারাপ বন্ধু থাকা ভাল। তাতে ছেলে বিগড়োয় কম। দ্যাখো না, বড় রোগ আটকাতে শরীরে ছোটখাটো জার্ম ঢোকাতে হয়? নইলে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় না। সুপ্রতিম বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাচ্ছে। দুল্‌কি চালে বলল—আমার সব বন্ধুরাই কি ধোয়া তুলসী পাতা ছিল নাকি? সীতেশ বলে আমার একটি হেভি ইন্টিমেট বন্ধু ছিল, সে পরে গ্যাঙ্‌রেপের কেসে আসামী হয়ে যায়। ওরকম বন্ধু ছিল বলে আমি কি বখে গেছি?

—তা নয়। তবু...

—অত পুতুপুতু কোরো না তো। সবার সঙ্গে না মিশলে ভাল খারাপ চিনবে কী করে? তা ছাড়া সকলেরই কিছু না কিছু সৎ গুণ থাকে। সীতেশ কী সুন্দর কথা বলতে পারত। কাউকে কিছু বোঝাতে হলে দু' মিনিটে কন্‌ভিন্স করে ফেলত। আমি তো ওর কাছে কথা বলার টেকনিক শিখেছি। মোদ্দা কথা হল, যে যার কাছ থেকে যা নেয়...

অদিতি অল্প বিমর্ষ হয়ে গেল। সুপ্রতিমের সঙ্গে পাপাই তাতাইকে নিয়ে যদি কখনও আলোচনা করতে যায়ও, সঙ্গে সঙ্গে যেন বিরোধী পক্ষ হয়ে যায় সুপ্রতিম।

গোমড়া মুখে অদিতি বলল—আমি তো বলিনি ওর সঙ্গীসাথীরা বদ, বলেছি ওদের আমার পছন্দ হয় না। কেমন যেন। আপস্টার্ট। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বলে মনেই হয় না। কেমন বেনিয়া বেনিয়া ভাব। গাড়ি রয়েছে, মোটর সাইকেল রয়েছে...দামি দামি জামাকাপড় পরে...

—তা হলে তো ভাল খবর। ছেলে বেশ তালেবর হয়েছে। ওস্তাদ ওস্তাদ বন্ধু জোগাড় করেছে।

—হুঁহ্, তালেবরই বটে। কী খরচের হাত হয়েছে জানো? পরশু পঞ্চাশ টাকা নিল, আজ আবার টাকা চায়...

—তাই? সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জানলার বাইরে ছুড়ল সুপ্রতিম। মুখে হাসিটি ধরে আছে—কাল তো ছোকরা আমার কাছ থেকে একশো টাকা নিল।

—তুমি তো আমাকে বলোনি? অদিতি রুক্ষ হল সামান্য।

—বলার কী আছে? চাইল...। অদিতির মুখ দেখে হুবহু তাতাই-এর মতো হাত তুলেছে সুপ্রতিম—ঠিক আছে, আর দেব না।

অদিতি গুম হয়ে গেল। ছেলেদের এই আল্‌গা আদর দেখানোর স্বভাবটা

আগাগোড়াই আছে সুপ্রতিমের। দুই ভাই এক খাটে শোবে না, শুলেই মারামারি, দুই ছেলের জন্য আলাদা আলাদা খাট এসে গেল। তাতাই দাদার পুরনো প্যান্টজামা পরবে না, পুরনো বই ছোঁবে না, অতএব সেগুলো ফেলে দাও। একই জিনিস ডবল ডবল কিনে আনো। টেবিল চেয়ার আলমারি বুকসেলফ। দাদার যা আছে, ভাইয়েরও অবিকল তাই চাই। একবার অদিতি পাপাইয়ের জন্য একটা বড় ওয়াটার বটল্ এনেছিল, তাতাইয়ের জন্য একটু ছোট, সারাদিন পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছিল তাতাই। অদিতি বলেছিল, যত খুশি কাঁদ, ওই ওয়াটার বটল্ই ব্যবহার করতে হবে তোকে। সুপ্রতিম দু' দিনের মধ্যে পাপাইয়ের মতো একটা জলের বোতল এনে দিল তাতাইকে। কী খারাপ অভ্যেস! পাপাই অবশ্য মুখে তেমন আব্দেরে ছিল না কোনওদিনই, তবু তাকেও কম দিয়েছে সুপ্রতিম! পুজোর বাজারে বেরিয়ে সব থেকে দামি পোশাকটির দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকত পাপাই, নামিয়ে হাত বোলাত, সরাসরি চাইত না। সুপ্রতিম কিন্তু কিনে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচশো সাতশো কুছ পরোয়া নেই। অত দামি জিনিস কিনে দিতে গা কিচকিচ করত অদিতির, মনে হত দু' দিন বাদেই তো ছোট হয়ে যাবে, এত অপচয়! সুপ্রতিম নিরুত্তাপ। ফর হুম আই অ্যাম আর্নিং মানি ম্যাডাম! ছেলেদের ভালভাবে মানুষ করার জন্যই তো, নাকি! কী বলবে অদিতি, সে তো শুধু কাজের লোক। হ্যাঁ, গালভরা অনেক নাম আছে বটে! স্ত্রী! মা!

ট্যাক্সি অনেকটা পথ চলে গেছে। নিউআলিপুর পেরিয়ে তারাতলার মোড় ঘুরল। রাস্তাঘাটে পথচারী কমে এসেছে, হয়তো চকিত ঠাণ্ডাটার জন্যই। গাড়িঘোড়ার ভিড় আছে, তবে তাও যেন আজ তেমন বেশি নয়।

সুপ্রতিম কাঁধ ছুঁল অদিতির—কেন এরকম মুড অফ করছ? একটা আনন্দের পরিবেশে যাচ্ছি...। আরে বাবা, তুমি হলে আমার সংসারের স্টিয়ারিং, সবাই আমরা তোমার কন্ট্রোলে থাকি। তোমার যা পছন্দ হবে না, স্ট্রেটকাট বলে দাও। দ্যাখো তোমার কথা কেউ শোনে কিনা।

অদিতি কিচ্ছু বলল না। বড় করে নিশ্বাস নিল একটা। বাতাসটা অনেকক্ষণ জমিয়ে রাখল বুকে। ছাড়ল। হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুখে। ফুটল কি?

রূপকদের বাড়িটা দোতলা। নতুন। খুব বড় না, ছোটই। কিন্তু একদম রাস্তার ওপরেই। রূপক দোতলায় ছিল, সুপ্রতিমদের ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে তরতরিয়ে নেমে এসেছে নীচে—কীরে, তোরা এত দেরি করলি?

—আর বলিস না। সুপ্রতিম টেরচা চোখে বেমালুম দেখিয়ে দিল অদিতিকে—পালিশ চুনকামে এত টাইম লাগাল! এই শাড়ি চলবে না, ওই শাড়ি চলবে না...

অদিতি কটমট করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুপ্রতিম রূপকের হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে—মেনি হ্যাপি রিটার্নস্ অফ দা ডে। শালা, একসঙ্গে পঁচিশটা

বছর পার করে দিলি মাইরি !

অদিতির বাড়িয়ে দেওয়া ফুলের তোড়া গদার মতো হাতে ঝুলিয়ে নিল রূপক। গর্বিত মুখে বলল—অফকোর্স। আশা করছি আরও পঁচিশ বছর কাটাতে পারব।

—দ্যাটস্ দা স্পিরিট। বন্ধুর কাঁধে জোর চাপড় মারল সুপ্রতিম, —মাল টাল কী আছে রে ?

—যা চাস্। হুইস্কি রাম জিন ভদ্‌কা ব্র্যান্ডি। শ্যাম্পেনও একটা ছিল। ফ্রেঞ্চ। তোরা দেরি করলি, শেষ হয়ে গেল।

—কুছ পরোয়া নেই। ...কে কে এসেছে ?

—সব্বাই। সোমেন তথাগত অনিরুদ্ধ...শুধু দীপকটা আসতে পারল না। ওর এমন একটা বিশ্রী ফ্যাচাং চলছে ! বলতে বলতে আজকের দিনের জন্য ধুতিপাঞ্জাবি পরে নিপাট বাঙালি সেজে থাকা রূপক ঘুরল অদিতির দিকে—এই, তুমি ভেতরে যাও না। সীমারা সবাই তোমার জন্য ওয়েট করছে।

পার্টি বহুক্ষণ শুরু হয়েছে। বিয়ের রজত জয়ন্তী বলে কথা, উৎসবটা বেশ ঘটা করেই করছে রূপক। বন্ধুবান্ধব ছাড়া রূপকের আত্মীয়স্বজনও রয়েছে কিছু। শালা শালী ভাই ভাইয়ের বউ বোন ভগ্নিপতি। দোতলার ছোট হলঘর ফুল আর রাংতায় মোড়া। ঘরে হাল্কা সবজেটে আলো। দুটো পেল্লাই অ্যামপ্লিফায়ারে দ্রুত লয়ে ইংরিজি বাজনা বাজছে। হলঘরের একদিকে কাচঘেরা ব্যালকনি আজকের পানশালা। রূপকের দুই মেয়েও দৌড়ে দৌড়ে পানীয়ের গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে অভ্যাগতদের। পান চলছে। নাচ চলছে। তালে। বেতালে। শাড়ি সালোয়ার জিনস্ ধুতি কুর্তাপাজামা সবই আজ নাচপোশাক।

অদিতি হলঘরে বসেছিল। সুপ্রতিমের বন্ধুর বউদের সঙ্গে। কস্তুরী সুদীপা গোপা প্রণতি...। সীমা ভারী শরীর নিয়ে প্রজাপতির মতো উড়ে আসছে মাঝে মাঝে, আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে অন্য নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে। সে আজ সেজেছেও খুব। দারুণ জমকালো সাদা বেনারসি, মাথায় ফুলের মালা, গা ভর্তি গয়না। তবু যেন সীমার চোখে কীসের যেন একটা ক্লান্তি দেখতে পাচ্ছিল অদিতি। আজকের ধকলের ক্লান্তি ? না বয়সের ?

এ সব পার্টিতে কারও কোনও পৃথক কথা থাকে না। এক ধরনের কথাই গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তার থেকেই ফুল্‌কি ছিটে হঠাৎ হঠাৎ হাসির ফোয়ারা ওঠে। কখনও বা তা নেহাতই বিশ্রম্ভালাপ হয়ে যায়। সোমেনের বউ কস্তুরী আর তথাগতর বউ সুদীপা দু'জনেই ভাল চাকরি করে, এ সব আসরে চাকুরে বউদের কথা একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনে অন্য বউরা। প্রায় একই কথা বলে তারা। সেই শাড়ি গয়না সিনেমা। পরচর্চা। সেই স্বামী ছেলে মেয়ে সংসার। কাজের লোক শাশুড়ি জা। তবু শোনে। হয়তো কোনও হীনমন্যতা থেকেই ওদের খোলা জানলা ভেবে ভ্রম হয়। প্রায় সকলেরই হাতে

গ্লাস ঘোরে, সাধ্যমতো নাচেও কেউ কেউ। রেওয়াজ।

অদিতিও ওই সবই করছিল। শুধু পানটাই খুব সীমিত তার। কোনও ছুঁৎমার্গের জন্য নয়, অ্যালকোহল পেটে গেলেই মাথাধরা আর অম্বলের রোগটা তার চাগিয়ে ওঠে। এই ধরনের জমায়েত মন্দ লাগে না তার, কিন্তু কিছুতেই যেন তেমন উচ্ছল হতে পারে না। শোনা দেখাতেই তার সুখ বেশি, ডুবে যাওয়াতে নয়। স্বভাব।

সুপ্রতিম কিন্তু পার্টিতে এলেই টগবগে ঘোড়া। এক দমে গ্লাস নিঃশেষ করে দেরিতে আসা পুষিয়ে নেয়, তিন-চার পেগ গিলেই সে প্রস্ফুটিত হতে শুরু করে। উচ্চৈঃস্বরে বকে, প্রবল বিক্রমে হাত পা ছুড়ে নাচে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অকারণে। কোনও কোনওদিন গানও শুরু করে, তার কণ্ঠটি যেমন বিশুদ্ধ বেসুরো, গানের কলিও তেমনই ভুলভাল। পার্টিতে এ সবই গা-সওয়া, অনেকেই সুপ্রতিমকে তাতিয়ে দিয়ে মজা লোটে খুব।

অদিতি আজ অত দূর গড়াতে দিল না। *ঠেলেঠুলে* এগারোটার আগেই তুলে ফেলল সুপ্রতিমকে। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে।

ফিরছে অদিতিরা। ট্যাক্সিতে।

সুপ্রতিম সিটে মাথা দিয়ে গড়িয়ে আছে। হঠাৎ বলল—আজ পার্টিটা তেমন জমল না।

অদিতি ঠাট্টা ছুড়ল—কেন, বেশ তো শুরু করেছিলে। জন জানি জনার্দন। রম্ পম্ পম্। রম্ পম্ পম্। ড্রিঙ্ক করলেই ওরকম হয়ে যাও কেন ?

সুপ্রতিম সোজা হয়ে বসল—তুমি তো জানোই সুপ্রতিম মজুমদারকে মদ কখনও মাতাল করতে পারে না। ওটা তো একটু ধুম্‌কির ভান। একটু রিলিজ করা। বন্ধুবান্ধবদের পার্টিতেও যদি নিজেকে খুলতে না পারি, কোথায় খুলব বলো তো ?

—বয়স হচ্ছে এটা তো খেয়াল রাখবে ?

—বয়স ? বয়স তো একটা মেন্টাল ফিক্সেশান। বয়স-টয়স বলে কিস্যু নেই। চঞ্চল বাতাস উঠেছে একটা, অদিতির কাচটা এ বার সুপ্রতিমই তুলে দিল। তিন-চারটে কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরাল একটা গম্ভীর মুখে বলল—বয়স যদি ফ্যাক্টরই হবে তবে দীপকের ইন্সিডেন্টটা হয় ? অ্যাট দিস্ এজ দে আর রানিং ফর সেপারেশান। শর্মিলা নাকি একটা তিরিশ বছরের ছেলের প্রেমে পড়েছে।

অদিতি মাথা রাখল সিটে—আমি তো উল্টো শুনলাম। দীপকদাই নাকি একটা বুড়ির সঙ্গে লটঘট চালাচ্ছে।

সুপ্রতিম একটু চুপ করে রইল। তারপর হা হা হেসে উঠে বলল, —হতেও পারে। লেট দেম গো টু হেল্। কাম টু দা পয়েন্ট। আমরাও কিন্তু পঁচিশের দিকে এগোচ্ছি, মনে আছে ?

অদিতি শুধরে দিল—পঁচিশ নয় স্যার, সামনের জুলাইতে চব্বিশ হবে।

—কথা কেটো না। এই জুলাই না সই, সামনের জুলাইতে তো হবেই। তুড়ি মেরে হাই তাড়াল সুপ্রতিম—রূপক কী করেছে, আমি এর থেকে অনেক গরজাস্ ফাংশান করব। মালাবদল টদল তো হবেই, ভাবছি একটা নহবতখানা বসিয়ে দেব। সকাল থেকে প্যাঁ পোঁ সানাই বাজবে।

—ছিহ্, তোমার কি লজ্জাশরম নেই ? অত বড় বড় ছেলে...

—আরে, ওরাই তো হোস্ট্ হবে। প্রধান নিমন্ত্রণকর্তা। বাপের বিয়ে কাকে বলে দেখুক ছেলেরা ! নিজের বিয়েটা আমার কনট্রোলে ছিল না, এই সেরিমোনিটা পুরো আমার গ্রিপে থাকবে।

অদিতি হেসে ফেলল—সব ব্যাপার নিয়ে ফাজলামি করাটা তোমার আর গেল না।

—ফাজলামি নয়, আমি সিরিয়াস। সুপ্রতিম আচমকা ঘুরে বসল। চোখ ছোট করে দেখছে অদিতিকে। ঘাড় নেড়ে বলল, এই যে পঁচিশ বছর আমরা একসঙ্গে কাটিয়ে দিলাম, এটা কি কম কথা ! বিয়ে চাইলে অনেকবার হতে পারে, কিন্তু বিয়ের পঁচিশ বছর জীবনের একটা মাইলস্টোন্। এই পঁচিশ বছরে কনজুগাল লাইফে কী কী অ্যাচিভ করেছি তার একটা ডেমনস্ট্রেশান করব না ?

অদিতি আর হাসল না। অ্যাচিভ শব্দটা হঠাৎই ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠেছে বুকে। এই পঁচিশ বছরে অদিতি কী অর্জন করেছে ? স্বামী পুত্র সংসার স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা ? নাকি একটু একটু করে একা হয়ে যাওয়া ? এক ভাঙা ভাঙা নিঃসঙ্গতা ? কী ?

॥ চার ॥

অলকেশ বাস থেকে পিছলে পড়ে পা ভেঙেছে, প্লাস্টার করে শুয়ে আছে বিছানায়। ভাইঝির ফোন পেয়ে দুপুরবেলা আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে গেল অদিতি। দাদাকে দেখতে।

বাপের বাড়িতে অদিতির আজকাল আর তেমন আসা হয় না। মা যতদিন ছিলেন, এ বাড়ির সঙ্গে গ্রন্থিটা অনেক মোটা ছিল, রোজ না হলেও সপ্তাহে এক-আধবার তো আসতই। চার বছর আগে মা মারা গেলেন, তারপর থেকে গ্রন্থি ক্রমশ কৃশ থেকে কৃশতর। বিজয়া, ভাইফোঁটা, ছোটখাটো পারিবারিক অনুষ্ঠান, এরাই এখন সম্পর্কর সুতো। দাদা বউদিও সেভাবে আসা যাওয়া করে কই ! একমাত্র দাদার মেয়েটাই যা যোগসূত্র। তুলতুলি যাদবপুরে এম এ পড়ছে, এখনও সে মাঝে মাঝে চলে আসে পিসির কাছে।

অদিতি একটা মোড়া টেনে দাদার সামনে বসল, —কীরে, পড়লি কী করে ?

অলকেশ মনমরা হয়ে শুয়েছিল, বোনকে দেখে মুখটা উজ্জ্বল হয়েছে।

বলল—আর বলিস না, ভাবলাম লাফ দিয়ে পাদানিটা পেয়ে যাব, পা-টা কিছুতেই উঠল না।

হাত দিয়ে দিয়ে দাদার ডান হাঁটুর প্লাস্টারটা নিরীক্ষণ করল অদিতি—একদম ভেঙেই গেছে, না মচকেছে?

—না, ডিস্‌লোকেশন। সেট হয়ে যাবে। শুধু দেড় মাস শুয়ে থাকতে হবে এই যা।

—তোর ডান হাঁটুটাও কমজোরি হয়ে গেল রে দাদা!

—বাঁ পায়ের কথাটা তোর মনে আছে?

—নেই আবার। পিন্‌কাদা ন্যাড়াদার কাঁধে ভর দিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে মাঠ থেকে ফিরলি তুই। ফিরেই কান্না, এ সিজন্‌টা আর আমার খেলা হবে না। সারা রাত মা জেগে রইল, চুনহলুদ বাটা গরম করে লাগাচ্ছে বার বার! বাবা গজগজ করছে! কেন এই খেলতে যাওয়া! কেন এই খেলতে যাওয়া!

—হ্যাঁ, আমি যখন হাসপাতাল থেকে প্লাস্টার করে ফিরলাম, তুই তো দরজায় দাঁড়িয়ে খুব হাততালি দিয়েছিলি। খোঁড়া ল্যাঙ ল্যাঙ ল্যাঙ, কার বাড়িতে হাঁড়ি খেয়েছিস, কে ভেঙেছে ঠ্যাং!

অলকেশের কথা বলার ভঙ্গিতে ঘরসুদ্ধ লোক হাসছে। অদিতির বউদি ভাইপো ভাইঝি সব্বাই। অদিতিও হাসছিল। তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন এক চাপা বিষণ্ণতাও উঁকি ঝুঁকি মারছিল মাঝে মাঝে। এ বাড়িতে এলেই ইদানীং এমনটা হয়। প্রাচীন বাড়িটার এখন আর কোনও ছিরিছাঁদ নেই, মোটা মোটা দেওয়াল স্যাঁতসেতে, নোনাধরা। তবু যেন এই অনুজ্জ্বল বাড়িটাতে পা রাখলেই বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া কৈশোর কোমর জড়িয়ে ধরে আজকাল, অদিতির আঁচল ধরে টানতে থাকে। সামান্যতম অছিলায়। কারণে অকারণে। কেন এমন হয়?

বয়স? মা-র না থাকা? নাকি অদিতি বিয়ের পর থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে সংসারে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে পিছন ফিরে তাকানো হয়নি বহুকাল? অথবা দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা চিড় খেয়ে যাওয়া?

বড় তুচ্ছ কারণে দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা ঢিলে হয়ে গেল অদিতির। মা মারা যাওয়ার পর অদিতিকে দিয়ে গোটা কতক কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল দাদা। কোন্ কাগজ কীসের কাগজ অদিতি পড়েই দেখেনি। দাদা বলল সই করতে এই না যথেষ্ট। পরে জানল দাদা না-দাবিপত্রে সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অদিতি নাকি স্বেচ্ছায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির অধিকার ছেড়ে দিল দাদাকে! শুনে সুপ্রতিমের কী বকুনি! তুমি বাড়ির ভাগ নাও, না নাও, তোমাকে একবার অফার করবে না দাদা! নিদেনপক্ষে কোন্ কাগজে সই করাচ্ছে সেটাও বোনকে বলে নেবে না! তোমারও বলিহারি! লেখাপড়া শিখেছ, দুমদাম না দেখে সই মেরে দিলে!

অদিতির মনেও খোঁচা মেরেছিল কথাটা। দাদা সরকারি অফিসের সামান্য

চাকুরে, লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল, এখন বড়বাবু, অদিতির মতো তেমন সচ্ছল অবস্থা তার নয়, ছেলের এখনও চাকরি হয়নি, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—এমন দাদার কাছ থেকে কি বাড়ির ভাগ চাইত অদিতি ? কখনওই না। কিন্তু অমন চুপি চুপি সই করিয়ে নিয়ে গেল কেন ?

পরে আর-একটা কাগজ সই করাতে এল দাদা। মা-র ফিক্সড ডিপোজিট সংক্রান্ত। অদিতি সেদিন ছেড়ে কথা বলেনি। সোজা বলে দিল—আমাকে কি এটারও ভাগ ছেড়ে দিতে হবে ?

ক্ষণকালের জন্য দাদা বিমূঢ়। আমতা আমতা করে বলল—সামান্য তো কটা টাকা। মাত্র দশ হাজার। তুই এর ভাগ নিবি খুকু ?

তেতো মুখে অদিতি বলেছিল—দশ হাজার টাকাটা কোনও কথা নয় রে দাদা। আমি যদি বোন না হয়ে তোর ভাই হতাম, তা হলে কি তুই এ ভাবে আমাকে কিছু না জানিয়ে ঝপঝপ করে সব কাগজে সই করিয়ে নিতে পারতিস ?

দাদার মুখ ফ্যাকাশে—অত কথার কী আছে, এ টাকার ভাগ আমি তোকে দিয়ে যাব।

বউদি তখন দাদার পাশেই বসে। ফস্ করে বউদি বলে উঠল—তুমি সম্পত্তির ভাগ চাও সেটা আগে বলে দিলেই পারতে। আমাদের ধারণা ছিল তোমার এত আছে, তুমি হয়তো নেবে না।

অদিতি সেদিন কিছুতেই দাদা-বউদিকে বোঝাতে পারেনি ভাগ নেওয়াটা বড় কথা নয়, অদিতির যে একটা অধিকার আছে সেটাকে অবজ্ঞা করাটা অন্যায়। বোনকে অসম্মান করা। টাকাটাও অদিতি নেয়নি, কিন্তু ওই কথাটুকুই মনে লেগে গেল দাদা-বউদির। মা-র বাৎসরিকের আগে পর্যন্ত অদিতির বাড়ির ছায়া মাড়াল না। কালে কালে ক্ষোভ থিতিয়ে এল। তবে সম্পর্ক আর নিখুঁতভাবে জোড়া লাগল না, কোথায় যেন সরু ফাঁক রয়েই গেল একটা।

মা বাবা না থাকলেই কি ভাই-বোনের সম্পর্কে অদৃশ্য ঘুণপোকারা এসে বাসা বাঁধে ? ছোটবেলার সমস্ত টান, ভালবাসা, খুনসুটি, মনকেমন করাগুলো নিরর্থক হয়ে যায় ?

নাকি কিছু থেকেই যায় ? ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি হয়ে ? যেমনটি আজ বলছে দাদা ?

তিপ্পান্ন বছরের দাদা আর পঁয়তাল্লিশ বছরের বোন শৈশব সেঁচে মণিমুক্তো কুড়োচ্ছে। চা-মিষ্টি হাতে দাঁড়িয়ে আছে বউদি। তুলতুলি রুণ্টু টীকাটিপ্পনি কাটছে বাবা পিসিকে নিয়ে। এক অসহ্য সুখের পারিবারিক দৃশ্য।

এর মধ্যেও কাঁটা থাকে !

শীত শহরের দখল নিয়ে নিয়েছে। শেষদুপুরেই ঠাণ্ডা বেশ কড়া। আমহার্স্ট স্ট্রিটের এই বাড়িটা পিছনের প্লটের বাড়ি, প্রায় বদ্ধ, আলোবাতাসহীন। দেওয়াল থেকেও যেন হিমকণা বিচ্ছুরিত হয় এখানে।

অদিতি শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। হুস হুস চুমুক দিচ্ছে চায়ে। বউদিকে বলল—তুলতুলির আর কোনও সম্বন্ধ এল ?

—এসেছিল। ছেলে ইনসিওরেন্সে চাকরি করে। জুনিয়ার অফিসার। তোমার ভাইঝির পছন্দ হল না।

—কেন, দেখতে ভাল নয় বুঝি ?

—জানি না বাপু। তোমার ভাইঝিকে জিজ্ঞেস করো। মেয়েমানুষের অত নাক উঁচু হলে চলে ?

—সে ভীষণ বেঁটে গো পিসি। তুলতুলি মুখ বেঁকাল—গায়ের রংটাও যা না! পিচরাস্তা।

—তুমি এমন কি অপ্সরী ? শিবানীও ঝেঁজে উঠেছে—সম্বন্ধটা অনেক দূর এগিয়েছিল গো। তোমার ভাইঝিকে ওদের খুব পছন্দ ছিল।

তুলতুলি হাউমাউ করে উঠল—হলেই হল, আমার কোনও মতামত নেই ? আমি তো বলেই দিয়েছি আমার জন্য ছেলে দেখতে হবে না। আগে একটা চাকরি-বাকরি পাই, তারপর দেখা যাবে।

—আসল কথা বলো, বাবা মা-র পছন্দে মন উঠবে না। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে।

—সেটাই তো ভাল। তোমাদের পরে দুষতে পারবে না। অদিতি হেসে ভুরু নাচাল। তুলতুলিকে বলল—হ্যাঁ রে, ঠিক করা আছে নাকি ?

রুন্টু অনেকক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, এবার আর ফুট না কেটে পারল না। বলল—ওদের যাদবপুর তো বৃন্দাবন, না ঠিক থাকাটাই আশ্চর্য।

অদিতি ঠোঁট টিপল—বৃন্দাবন, না নবদ্বীপ রে ? তাতাই তো বলে ওখানে নাকি চোখে চোখ মিললেই কণ্ঠীবদল হয়ে যায়। সত্যি ?

—বলেছে এ কথা ? তুলতুলির গোলগাল মিষ্টি মিষ্টি মুখে রাগের ছল—আমি যাই, নেক্সট দিন গিয়ে ওর কান মুলে দেব।

অলকেশও মিটিমিটি হাসছে। এ ধরনের আলোচনাতে একটু অস্বস্তিও বোধ করছে যেন। পা সামলে বিছানায় উঠে বসে বলল—এই খুকু, পাপাইয়ের পার্ট টু-র প্রিপারেশন কেমন চলছে রে ?

—বলছে তো হচ্ছে মোটামুটি।

রুন্টু বলল—পাপাইয়ের ওইরকমই কথা। রেজাল্ট বেরোলে দেখা যাবে ফাটিয়ে দিয়েছে।

অলকেশ বলল—বি এসসি পাশ করে কী করবে কিছু ঠিক করেছে ?

—এম এসসি পড়বে। রিসার্চে জয়েন করবে। ওর তো লেখাপড়ার লাইনেই ইন্টারেস্ট, মনে হয় প্রফেসারি-টফেসারির দিকেই যাবে।

—ওকে সিভিল সার্ভিসে বসা না। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কোনও আই এ এস-আই পি এস নেই। ভাগ্নেকে দেখে আমরাও একটু বুক ফোলাই।

অদিতির মনেও সেরকমই একটা সূক্ষ্ম বাসনা ছিল ছেলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবে, বিশাল কোয়ার্টার পাবে, অদিতি গিয়ে অবরে-সবরে থেকে আসবে সেখানে। ছেলের জিপে চড়ে বেড়াবে এদিক সেদিক। দেখা যাক কী হয়।

রুণ্টু বলল—পাপাইটা বড় লাজুক। ও কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারবে না। এ ব্যাপারে তাতাই একদম ফিট্।

শিবানী হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল—তোমার কপালটা খুব ভাল। দুটো ছেলের দুটোই রত্ন। রুণ্টুটার যে কী হবে ?

রুণ্টু পলকে গম্ভীর। তুলতুলি ধমকাল মাকে,—আহ্ মা, থামো তো ! দাদা কি রোজগার করে না ?

অদিতি আড়চোখে দাদাকে দেখছিল। পরিবেশটা কেমন কেটে কেটে যাচ্ছে ! এককালে পাউরুটি আলুর দম খেয়ে ফুটবল মাঠে খেপ খেলে বেড়ানো হাট্টাকাট্টা দাদা এখন কেমন বসে আছে জবুথবু ! নিষ্পলক। আনমনা। কপালে বুঝি ভাঁজও এসে গেছে এলোমেলো। হয়তো রুণ্টুর ভাবনাতেই।

খুব আশা ছিল অদিতির, দাদা হয়তো রুণ্টুর চাকরির জন্য বলবে সুপ্রতিমকে। বি কম করে চার চারটে বছর বসে আছে রুণ্টু। ঠিক বসে নেই, প্রচুর টিউশনি করে। নিচু ক্লাশের। একটা ছোটখাটো কম্পিউটার কোর্সও করেছিল। রেজাল্ট খুব ভাল নয়, তবে দাদা একবার মুখ ফুটে সুপ্রতিমকে বললে একটা হিল্লে হয়তো হয়ে যেত। প্রায়ই সেলস লাইনে নতুন নতুন ছেলে নেয় সুপ্রতিমরা। চারদিকে নিজেরও বহু জানাশুনো সুপ্রতিমের। এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটার, এই পার্টি, ওই পার্টি। সুপ্রতিম তেমন গড়িমসি করলে অদিতিও চাপ দিতে পারত তখন।

দাদা বলে না। বলবেও না। বোনের ওপর অভিমান ? না বোনের কাছে আর ছোট করে দেখাতে চায় না নিজেকে ? নাকি আশা করে অদিতি সুপ্রতিমই যেচে... ! রুণ্টুটাও পিসির বাড়ি যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। হীনমন্যতা ?

এ কথা সে কথার পর উঠল অদিতি। বেরনোর আগে জোর জোর নিশ্বাস টানল কয়েকবার। কেমন একটা ভ্যাপসাটে গন্ধ, কোনওমতেই সুঘ্রাণ বলা যায় না, তবু শুঁকল প্রাণভরে। কী যেন মিশে আছে বাতাসটায় ! হলুদ শৈশব ! গোলাপী কৈশোর ! নীলচে যৌবন ! কী যেন !

অধিকার চলে যাওয়ার পর থেকেই কি গন্ধটা বেশি করে নাকে এসে লাগে অদিতির !

রাস্তায় নেমে অদিতি বাসে উঠল না। শেষ বিকেলের শীত মাখানো নরম রোদ্দুর মাড়িয়ে হেঁটে এল শিয়ালদায়। ট্রেনে ফিরবে।

স্টেশনে ঢোকার আগে বাড়ির জন্য কিছু ফল কিনল অদিতি। সুপ্রতিমের জন্য আঙুর, পাপাইয়ের জন্য কমলালেবু, তাতাইয়ের জন্য ন্যাশপাতি। অফিসফেরত যাত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যখন ঢাকুরিয়া স্টেশনে নামল, তখন

অন্ধকার গা বিছিয়েছে চতুর্দিকে।

বাড়ি ফিরেই অদিতি চমকে গেল। আবার হেমেনমামা এসেছে। সোফায় বসে দিব্যি গল্প করছে পাপাইয়ের সঙ্গে। পরনে সেই একই পোশাক। শুধু সুতির চাদর পাল্টে সাদা এক শাল এসেছে গায়ে।

অদিতি কথা বলার আগেই হেমেন গৃহকর্তার ভঙ্গিতে দু' হাত ছড়িয়েছেন দু' দিকে—সুস্বাগতম্।

দুপুর থেকে বুড়বুড়ি কেটে চলা চোরা বিষাদের বুদ্‌বুদ্ নিমেষে উধাও। অকৃত্রিম খুশিতে হাসল অদিতি—আপনি কতক্ষণ ?

—ঘড়ির হিসেবে বলব ? না সময়ের হিসেবে ?

—সেটা কীরকম ?

—খুবই সরল। ঘড়ি ধরে বললে, আমি ঠিক পঞ্চাশ মিনিট হল এসেছি। সময়ের হিসেব করলে, এই মাত্র। তোমার ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে কী করে যে সময়টা চলে গেল !

অদিতি পাপাইয়ের দিকে তাকাল—কি রে দাদুকে চা-টা খাইয়েছিস ?

এবারও আগেই হেমেনের উত্তর,—শুধু চা নয়, আরও অনেক কিছু খাইয়েছে। পেস্ট্রি পোট্যাটো চিপস্...। তোমার ছেলে আপ্যায়নে কোনও ত্রুটিই রাখেনি।

সবিতা রান্না করতে এসে গেছে। ডাইনিং টেবিলের বড় কাচের পাত্রে ফলগুলো রেখে সোফায় বসল অদিতি। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল—তাতাই ফেরেনি ?

—না তো। পাপাই উঠে পড়েছে—তুমি এবার কথা বলো মা। আমাকে একটু শৌণকদের বাড়ি যেতে হবে।

হেমেন হাঁ হাঁ করে উঠলেন—তোমার সঙ্গে আলোচনাটা তো শেষ হল না ! বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের কোথায় বিরোধ সে ব্যাপারে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

—হবে একদিন। আজ আসি। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি ফুটিয়েই ঘরে ঢুকে গেল পাপাই। পুলওভার চড়িয়ে বেরিয়েও গেল মুহূর্তে।

অদিতি দরজা বন্ধ করে এসে তরল অভিযোগের সুরে বলল—বলেছিলেন শিগ্‌গিরই আসবেন। অ্যাদ্দিনে আপনার সময় হল ? এক মাস পর ?

—আমি কি আর বসে আছি রে ভাই। বলতে বলতে পাশে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের থলি থেকে একটা চটি মতন বই বার করে এগিয়ে দিলেন হেমেন। বললেন—আমার পত্রিকাটা দ্যাখো। লেটেস্ট ইসু। এর পেছনে কদিন যা খাটুনি গেল।

অদিতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল কাগজটাকে। নব্বই একশো পাতার বই। কবিতা গল্প প্রবন্ধ সবই আছে। বেশ কয়েকজন কবির নাম তো রীতিমতো পরিচিত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সবই ঝকঝকে। পরিপাটি। তুলোট

কাগজের মলাট। মলাটে কোনও ছবি নেই, শুধু কাগজটার নাম পাতা জুড়ে ছড়িয়ে আছে, ঢেউয়ের মতো। বহতা। সম্পাদকের নামও গাঢ় নীল রঙে জ্বলজ্বল। হেমেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক।

অদিতি জিজ্ঞাসা করল—আপনি এই কাগজটার কথাই বলছিলেন ?

হেমেন কেমনভাবে যেন তাকালেন অদিতির দিকে। বললেন—কাগজ নয়, পত্রিকা বলো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পত্রিকা। অদিতি অপ্রস্তুতভাবে হাসল—আপনি একাই পত্রিকাটা বার করছেন ?

হেমেন শব্দ করে হেসে উঠলেন। দরাজ গলায় বললেন—জীবনেই দোকা পেলাম না, পত্রিকায় দোকা পাব কোথ্থেকে ? তবে হ্যাঁ, আলিপুরদুয়ারে আমার দু'জন সহযোগী ছিল। দুই ছোকরা। আমারই ছাত্র।

আগের দিন অতশত গা করেনি অদিতি। আজ একটু নড়েচড়ে বসল। বলল—এ তো অনেক খরচের ব্যাপার হেমেনমামা ! আপনি একা একা...

—আরে বাবা, রিটায়ারমেন্টের পর কিছু টাকা তো পেয়েছি। সে টাকা কি আমি যক্ষের মতো বসে বসে আগলাব ? পুরনো বন্ধুবান্ধব কিছু আছে, তারা কয়েকটা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দিল...। গভর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনও আসতে শুরু করেছে...। এবার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা এসে গেলে কোনও প্রবলেম থাকবে না, বুঝেছ ?

অদিতির ঠিক ঠিক মাথায় ঢুকছিল না কথাগুলো। নিয়ম রাখার মতো করে বলল—ভালই করেছেন। মানুষকে তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে। চা খাবেন আবার ?

—বলো। ঠাণ্ডার দিনে চা-টা ভালই লাগে।...তবে আলিপুরদুয়ারের তুলনায় এখানকার শীত কিছুই নয়। সে হচ্ছে যাকে বলে বাঘকাঁপানো ঠাণ্ডা।

অদিতি চেঁচিয়ে চা করতে বলল সবিতাকে। হেমেনমামা আলিপুরদুয়ারের শীতের গল্প শোনাচ্ছে। কবে নাকি একটা বাঘ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, সোজা ঢুকে গিয়েছিল কার কাঠের বাড়িতে, বাড়িঅলার গা থেকে নাকি কম্বল খুলে নিয়েছিল বাঘটা ! বলার ভঙ্গি এত সরস যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল অদিতির। আগের দিন মানুষটা যেন সঙ্কুচিত ছিল সামান্য, আজ কত স্বচ্ছন্দ। খোলামেলা।

হেমেনমামা অনেক বদলে গেছে। অদিতিদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে যখন আসত, তখন কত গম্ভীর ধরনের ছিল। ঠিক যেন গম্ভীরও নয়, মিতবাক, শান্ত এক সৌম্য পুরুষ। হাসতও, কিন্তু মাপা হাসি।

হঠাৎ কথা থামিয়ে হেমেন বললেন—কই, যে জন্য এসেছি সেটা দাও।

অদিতি হোঁচট খেল—কী বলুন তো ?

—গল্পটা। নিয়ে এসো, পড়ে দেখি।

অদিতি আকাশ থেকে পড়ল—গল্প ! আমি... !

হেমেনও যেন ভীষণ অবাক—কেন, আগের দিন তোমাকে আমি বলে গেলাম না, একটা গল্প লিখে রাখতে ? আমার পত্রিকার জন্য ?

অদিতি সলজ্জভাবে বলল—বলেছিলেন। তবে...

—কী তবে ?

—লেখা-জোখা আর আমাকে দিয়ে হবে না। কবেই ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

হেমেনের মুখমণ্ডল পলকে বদলে গেল যেন। গোমড়া মুখে বললেন—আগের দিনও তুমি এই কথাই বলেছিলে। আমি তোমাকে বলেছিলাম চেষ্টা কোরো, নিশ্চয়ই পারবে। তুমি কি চেষ্টা করে দেখেছ ?

—না, তা করিনি...

—কেন করোনি ? সময় পাওনি ?

অদিতি সরাসরি মিথ্যে বলতে পারল না। বলল—তাও ঠিক নয়। এমনিই হয়ে ওঠেনি।

হেমেন কথা বাড়ালেন না আর। চুপ করে বসে আছেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুছলেন কাচ দুটোকে। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন—সবার সব ক্ষমতা থাকে না অদিতি। আবার প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে। গুণ থাকে। সেই গুণটার বিকাশ ঘটতে না দেওয়ার মানে হল নিজের জীবনকে নিজেই অপমান করা। এ এক ধরনের আত্মহত্যা। তোমার মধ্যে কিন্তু গুণটা ছিল।

অদিতির অস্বস্তি হচ্ছিল। আবার যেন ভালও লাগছিল শুনতে। মৃদু স্বরে বলল—সে যখন ছিল, তখন ছিল। এই তেইশ বছর ধরে ঘানি টানতে টানতে, ছেলেদের মানুষ করতে করতে...। মেয়েদের অনেক কিছুই ভুলে যেতে হয় হেমেনমামা। আপনি তো ঠিক সংসারি নন, আপনি বুঝবেন না।

—ওগুলো তোমাদের অজুহাত। তোমরা মেয়েরা ওই ধরনের কথা বলে নিজেদেরই সান্ত্বনা দিতে ভালবাসো। লেম্ এক্সকিউজ। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ? হেমেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন—তোমার একটা গল্প পড়েছিলাম। আজও মনে আছে। বোধহয় তোমার কোনও কলেজের ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। একটা মেয়ে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কুয়াশার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। চাপ চাপ কুয়াশা। যত সে কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ে, ততই সে নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করতে থাকে। নদী পাহাড় জঙ্গল জলপ্রপাত ঝর্না...। যেই কুয়াশাটা মিলিয়ে যায়, ওমনি দেখে তার সামনে কিছুটি নেই। তোমার মনে আছে গল্পটা ?

নিস্তরঙ্গ পুকুরের তলদেশে পড়ে থাকা ছোট্ট ঢিলের কুচিটা যেন উঠে আসছে। অদিতি খুব ধীরে মাথা নাড়ল—হুঁ, মনে আছে। গল্পটার নামও ছিল কুয়াশা।

—ওরকম একটা গল্প লেখার পরও তুমি বলতে চাও, তুমি আর লিখতে পারবে না ? তোমার কি মনে কোনও কথা জমে নেই ? তোমার কি নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে না ? হাতের কাছে কলম আছে, কাগজ আছে, বসে যাও। চেষ্টা করে দ্যাখো না, হয় কিনা। এখন তো তোমার সময় আছে। ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। সংসারের ঘানি টানার অজুহাত এখন আর তোমার খাটে না অদিতি।

অদিতি হেসে ফেলল—তা খাটে না। তবে বয়সও তো একটা ফ্যাক্টর, সেটা তো মানবেন ? এই বুড়ো বয়সে ওসব আর আসে ?

—না চেষ্টা করলে তুমি জানবে কী করে ? হ্যাঁ, এজ একটু তো ম্যাটার করে বটেই। মনের ওপর পলি পড়ে গেছে। অভ্যাস করে, চর্চা করে সেটাকে সরাতে হবে। বাট দা থিং ইজ্ দেয়ার।

সবিতা চা এনেছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে উত্তেজিত বৃদ্ধকে। অদিতিকে বলল—আমি কি চলে যাব বউদি ? আমার কিন্তু হয়ে গেছে।

—যা। কটা রুটি করেছিস আজ ?

—সতেরো আঠেরোটা।

—অতগুলো করলি কেন ? সকালে বললাম না, দাদা এ-বেলা খাবে না ! ফিরতে দেরি হবে !

সবিতা জিভ কাটল।

—থাক, যা করেছিস, করেছিস। ক্যাসারোল চেপে বন্ধ করেছিস তো ? রুটি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাইদের মেজাজ কিন্তু গরম হয়ে যাবে।

—চেপেই বন্ধ করেছি।

—ঠিক আছে, সকালে তাড়াতাড়ি আসিস। অদিতি কথাটুকু শেষ করে হেমেনের দিকে তাকাল—শুনলেন তো ? এ-সবও মাথায় রাখতে হয়।

হেমেন অনেকটা স্থিত হয়েছেন। অল্প হেসে বললেন, রামকৃষ্ণদেবের একটা কথা আছে, জানো তো ? কখন ঢেউ আসবে না, তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলে, সমুদ্রে আর স্নান করাই হবে না।

ঠাণ্ডা বাতাস আসছে একটা। জানলা দরজা সব বন্ধ, তবু কোথা থেকে ঢুকছে বাতাসটা ?

হেমেন চায়ে চুমুক দিয়েছেন। আপন মনে বলছেন—শোনো অদিতি, তোমার কথা আমার মাথাতেই ছিল না। আলিপুরদুয়ার থেকে যখন পাকাপাকিভাবে ফিরে এলাম, তখনও মনে পড়েনি। একদিন হঠাৎ বিমলের সঙ্গে দেখা। ডালহাউসিতে। তোমার ছোটমামা বোধহয় পেনশান-টেনশন তুলতে এসেছিল। তারপর একদিন ওর ভবানীপুরের বাড়িতে গেলাম। এ গল্প। সে গল্প : হঠাৎ তোমার কথা উঠল। সেই তোমাদের বাড়িতে যেতাম, তুমি তোমার লেখা দেখিয়েছিলে, সে কথাও হল। বিমল বলল, তুমি নাকি এখন ঘোর সংসারী। কৃতী স্বামী, কৃতী সন্তানদের নিয়ে যাকে বলে একেবারে

আপ্লুত হয়ে আছ। শুনে কেমন যেন মনে হল, যাই তোমাকে একটু টোকা দিয়ে আসি। এত ভাল লেখার হাত ছিল তোমার! এত সুন্দর অবজারভেশান! এত সুন্দর ভাষা! তোমার একটা নিজস্ব ইনসাইট আছে। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী? আমি আবার মাসখানেক পরে আসব। তখন কি তোমার কাছ থেকে একটা লেখা আশা করতে পারি?

অদিতি ঘাড় নাড়ল কি না, নিজেই বুঝতে পারল না। সম্ভবত নাড়ল। না হলে হেমেনমামার মুখে হাসি ফুটল কেন?

হেমেন চলে গেলেন।

অদিতি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে।

পৃথিবী শীতল হচ্ছে ক্রমশ। বায়ুমণ্ডলে পাতলা কুয়াশার পর্দা। কম্পাউন্ডের গেটের সামনেই অত্যুজ্জ্বল রাস্তার বাতি, দূর থেকে তাও যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। চতুর্দিকের দরজা জানলা বন্ধ ইট কাঠের অবয়বগুলোকেও এখন কেমন ভৌতিক লাগে।

পাপাই তাতাই ফিরল না এখনও। সুপ্রতিমও কখন ফিরবে কে জানে! অদিতি গ্রিল থেকে সরে টিয়ার সামনে এলো। সন্তর্পণে হাত রাখল খাঁচার তারে। রেখেই সরিয়ে নিয়েছে হাত। খাঁচাটা কনকনে ঠাণ্ডা, ছ্যাঁকা লাগে।

পাখি ঝিমোচ্ছে। অন্ধকার নামলেই চুপ মেরে যায় টিয়াটা। অথচ সামনে পল্‌কা ছায়া দেখলেও ঠিক টের পায়, চোখ খুলে তাকায় এদিক ওদিক।

অদিতি ফিসফিস করে শুধোল—এই টিয়া, গল্প লিখবি?

ব্যালকনির ছায়া ছায়া আঁধারে স্বরটাকে খুঁজছে টিয়া।

অদিতি ফের শুধোল—কী লিখবি বল তো? আসে কিছু মাথায়?

টিয়া নড়ে বসে।

—সারাদিন তো আফিংখোরের মতো ঢুলিস, আর মাঝে মাঝে ক্যাঁ ক্যাঁ চিৎকার, এর বাইরে তোর আর কিছু করার আছে?

টিয়া চুপ।

—লেখ না যা হোক কিছু। পাগলবুড়োটা এত করে বলে গেল...।

টিয়া একটু চঞ্চল হয়েছে। টিপ টিপ ঘাড় দোলাচ্ছে।

—নিজের কথাই লেখ্ না হয়। ধর তোর দাদার পা ভেঙে গেছে। ভাঙেনি, মনে কর চিড় খেয়েছে। তুই তোর দাদাকে খুব ভালবাসতিস, কত স্মৃতি আছে তোর দাদাকে নিয়ে...। তা তুই দাদাকে দেখতে গেছিস। অনেকদিন পর। মাঝে ওই সই করানোর ব্যাপারটা রেখে দে না। দুজনের মনের কথাই লেখ। দাদারও। বোনেরও। তারপর? তারপর? বানা না, বানা। একটা ফিলিং-এ নিয়ে যা গল্পটাকে। একটা সুন্দর রিলেশান চিড় খেয়ে যাওয়ার অনুভূতি।

অদিতি উৎসুক হয়ে ঝুঁকল খাঁচার দিকে—কিরে, পারবি না?

॥ পাঁচ ॥

পৌষ ফুরোনোর আগেই এবার ঝুপ করে কমে গেল শীতটা। প্রায়দিনই এখন মেঘ করে থাকে, বৃষ্টিও হচ্ছে ঘন ঘন। মুষলধারে কিছু নয়, ঝিরঝির ঝিরঝির। সৃষ্টিছাড়া এই মেঘের পল্টন কোত্থেকে যে এল ! লাভের মধ্যে লাভ রোজ বাজারে সবজিঅলারা শাসাচ্ছে এরকম চললে ফুলকপি বাঁধাকপির দর নাকি বেড়ে যাবে চার গুণ। ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখও বেড়েছে হঠাৎ। একটু ভিজলেই সর্দি কাশি জ্বর।

তাতাইয়েরও কাল থেকে অল্প অল্প গলা ব্যথা। গ্ল্যান্ড ফুলেছে। রাত্রে শুধু দুধরুটি খেল আজ। অন্য সময়ে অদিতিকে কতবার বলতে হয়, আজ খেয়ে উঠেই বাধ্য ছেলের মতো গলায় মাফলার পেঁচিয়েছে তাতাই। অদিতির শাল গায়ে জড়িয়ে টিভি খুলে বসেছে।

টেনিস চলছে টিভিতে। কোন্ এক টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল। আন্দ্রে আগাশি আর মাইকেল চ্যাং। এ কোর্ট ও কোর্ট, ও কোর্ট এ কোর্ট, র‍্যালি চলছে জোর।

তাতাই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছুড়ল শূন্যে— কামঅন্ আগাশি, কিল হিম।

হাঁটু ঝোলা জিনসের ওপর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি চড়িয়ে ভাইয়ের পাশে এসে বসল পাপাই। রঙিন পর্দায় চোখ রেখে বলল,— কী স্কোর চলছে রে ?

হলদেটে টেনিস বলের সঙ্গে চোখের মণি ঘুরে চলেছে তাতাইয়ের। ঘুরন্ত চোখেই বলল,— যা হওয়ার তাই হচ্ছে। আগাশি ইজ উইনিং। ফার্স্ট সেট পেয়ে গেছে।

—ও তো হেরে যাবে। পাপাই সেন্টার টেবিলে পা তুলে দিল।

—কেন ?

—অত প্লেবয়গিরি করে টেনিস খেলা হয় না। টেনিসে অনেক মেন্টাল ডিসিপ্লিন লাগে।

—তুই আগাশির র‍্যাঙ্কিং জানিস ! কোথায় আগাশি, কোথায় চ্যাং !

—র‍্যাঙ্কিং দিয়ে সব হয় না। চ্যাং-এর টেনাসিটি অনেক বেশি। চাইনিজ অরিজিন আছে তো ...

তাতাই ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়েছে,— আগাশি জিতবে না বলছিস ?

—নো চান্স। চ্যাং-এর দম অনেক বেশি। স্পিডও বেশি।

পাপাই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্র চিতাবাঘের মতো কোর্টের শেষ প্রান্ত থেকে নেটে ছুটে এসেছে চ্যাং। দুরন্ত একটা স্ম্যাশ করল লাফিয়ে। চোয়াল শক্ত করে র‍্যাকেট মাথার ওপর তুলে ঝাঁকাচ্ছে। দর্শকদের চিৎকার আর হাততালিতে কানে তালা লাগার জোগাড়। গমগম শব্দ বেজে উঠল। গেম টু চ্যাং।

তাতাই গুম্।

পাপাই নির্বিকার স্বরে বলল,— এই শুরু হয়ে গেল। এবার দ্যাখ...

এবার স্থির চোখে দাদাকে দেখছে তাতাই। চোখ ছোট করে বলল,— তুই কি আমাকে রাগাতে চাইছিস ?

—নাআ। যা ফ্যাক্ট তাই বলছি।

তাতাই আরও কয়েক সেকেন্ড দেখল দাদাকে। হঠাৎই তার মুখমণ্ডল ভরে গেছে অপার্থিব হাসিতে। বলল,— আমি আজ রাগব না রে দাদা। চেঁচাতে গেলে ভীষণ কাশি আসছে।

সুপ্রতিম হেসে ফেলল। দাঁত মাজতে মাজতে এতক্ষণ বেসিনের আয়নায় সে দেখছিল ছেলেদের। রাতে দাঁত মাজা তার দীর্ঘকালের অভ্যাস, খেয়ে উঠে দাঁতে একবার ব্রাশ না চালালে কেমন অপবিত্র অপবিত্র লাগে নিজেকে। বেশ কয়েকবার কুলকুচি করেও তৃপ্তি হচ্ছিল না সুপ্রতিমের, দাঁতের গোড়ায় জিভ চালাচ্ছে।

গলা উঁচিয়ে সুপ্রতিম ডাকল,— অ্যাই শুনছ ?

রান্নাঘরের সিঙ্কে বাসন নামাচ্ছিল অদিতি। সেখান থেকেই সাড়া দিয়েছে,— কী ?

—এদিকে শোনো না।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এল অদিতি,— হল কী ?

—একটা কাঠি দাও তো দেখি। দাঁতের ফাঁকে কইমাছের কাঁটা ফুটে গেছে।

—নিজের দেশলাই থেকে নিয়ে নাও না।

—আমার মোম দেশলাই। ও দিয়ে খোঁচানো যায় না।

বেজার মুখে রান্নাঘর থেকে গুনে গুনে দুটো কাঠি এনে দিল অদিতি। সুপ্রতিম দাঁত খোঁচাচ্ছে। হালকা উদ্বেগ নিয়ে দেখছে অদিতি,— বেরোল ?

—বেরোবে। দাঁতের গোড়ায় আবার জিভ বোলাল সুপ্রতিম,— তোমার কাজকর্ম হল ? কী পড়বে বলছিলে, পড়বে না ?

অদিতির বুকটা ধক করে উঠল। ছোট্ট নিশ্বাস নিয়ে দমন করল ভেতরের উত্তেজনাটাকে। সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করে বলল,— হ্যাঁ, পড়ব তো। রান্নাঘরটা একটু গুছিয়ে আসি।

—তাড়াতাড়ি করো। আজ একটু আর্লি শুয়ে পড়ব। কাল সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরোতে হবে।

—একটু বসে টিভি দ্যাখো না, আমি এক্ষুনি আসছি।

রান্নাঘরে এসে অবশ্য কাজে হাত দিল না অদিতি, চুপটি করে দাঁড়িয়েই রইল। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনিটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর আগে যেমনটি হত, ঠিক সেই অনুভূতি। লজ্জাও লাগছে খুব। অদিতি কি সেই জোড়াবিনুনি বাঁধা কিশোরী হয়ে গেল। পড়বে গল্পটা ? হাসবে না তো সবাই ?

হেমেনমামা চলে যাওয়ার পরদিনই কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিল অদিতি। নিরালা দুপুরে। উফ, সে কী কষ্ট। মাথার ভেতর ভেঁজে নিয়েছে গল্পটাকে, কিন্তু কিছুতেই শুরু আর হয় না। যেভাবেই আরম্ভ করে সেটাকেই যেন বেঠিক মনে হয়। এক লাইন লেখে, কেটে দেয়। আবার লেখে, আবাব কেটে দেয়। আপ্রাণ জেদে যদিবা প্রথম দুটো বাক্য লেখা গেল, তৃতীয় বাক্যটি আর কোথাও নেই। ঘরে, ড্রয়িং স্পেসে, রান্নাঘরে, খাবার জায়গায়, ব্যালকনিতে, বাথরুমে, মস্তিষ্কে, কোথাও নেই। কত চুল ছিঁড়ল অদিতি, কাগজ ছিঁড়ল, ব্রহ্মতালু জ্বলতে লাগল রাগে, তবু কলমে এল না বাক্য। প্রতিদিন যে দুপুরটা কচ্ছপের পিঠ হয়ে মড়ার মতো চোখের সামনে পড়ে থাকে, সেটা যেন কোন জাদুতে অলিম্পিকের দৌড়বীর হয়ে গেল! মাঝখান থেকে হলটা কী? মলিনার মা এসে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এ কী করেছ গো বউদি! ঘরময় এত কাগজ ছিঁড়েছ কেন! কচি ছেলের মতো!

তারপর আর বসাই হয় না, বসাই হয় না। পরের দিনই সকালে ছোট ননদ এল বাড়িতে। তার দুই মেয়ের দুটিই কনভেন্টের ছাত্রী, স্কুলে সদ্য ক্রিসমাসের ছুটি পড়েছে তাদের, বড়মামার বাড়ি ডে-স্পেন্ট করবে তারা। করলও বটে। সারা দুপুর ধরে হইহল্লা, সারা বিকেল লাফালাফি। গেল যখন, অদিতির তখন সব শক্তি নিঃশেষ, পরদিনও আর শরীর চলল না। তারপর তো ছুটিছাটার মরশুমই এসে গেল বাড়িতে। বড়দিন, একত্রিশে ডিসেম্বর, নিউ ইয়ার্স ডে। এ সময়ে বাপ-ছেলেদের জিভটাও চাগিয়ে ওঠে। দুপুরে বাড়ি থাকুক না থাকুক, ছেলেদের হুকুম চলছে অবিরাম। আজ বলে চকোলেট কেক বানাও, কাল বলে ফ্রুট কেক বানাও। কোনওদিন বিরিয়ানি চাই, তো কোনওদিন নবরতন পোলাও। সবই দোকান থেকে আনা যায়, তবে অদিতির হাতে না হলে কারও মন ওঠে না। এরই মধ্যে একদিন প্রেম জাগ্রত হল সুপ্রতিমের, নববর্ষের থিকথিকে ভিড়ে বউকে নিয়ে ঘুরে এল ডায়মন্ডহারবার। কী উচ্ছ্বাস! আহ্, শীতের গঙ্গাটা কী ফাইন! জলে রোদ্দুর পড়ে রঙটা কী লাগছে দ্যাখো, ঠিক যেন আমাদের বডি ম্যাসাজ অয়েল! ইস, এই গঙ্গার মতো যদি প্রোডাকশান দিতে পারতাম আমরা... !

তা এ-সব তো থাকবেই। সংসারধর্ম বলে কথা! সব কিছু কাটিয়ে-কুটিয়ে আবার একদিন বসল অদিতি। নিরালা দুপুরে। লেখে, কাটে, ছেঁড়ে, লেখে, শামুকের গতিতে এগোয় লেখা। বাপস্, এ কি সহজ কাজ! এ যে সৃষ্টি। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংগম ঘটিয়ে জন্ম দেওয়া। সন্তান গর্ভে ধরার মতো ধারণ করো চরিত্রদের, হৃদয় মন বুদ্ধি দিয়ে রক্তমাংসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করো, ভাষার কারুকাজে বাঁধ তাদের— এ এক শরীর নিংড়ানো সাধনা। দীর্ঘ অনভ্যাসে যা আরও বেশি দুরূহ। শব্দের পর সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, বাক্যের গঠন মনোমতো হয় না সহজে। দু পাতা লেখার পর গোঁয়ার ছেলের মতো গল্প ছোটে অন্য দিকে, তখন ভুলিয়ে ভালিয়ে ফিরিয়ে আনো তাকে,

সাজিয়ে গুছিয়ে বসাও কাগজে। একদিন তো অদিতি ফাঁকা ফ্ল্যাটে পা ছড়িয়ে কাঁদতেই বসে গেল। নিজেদের নিয়ে গল্প বানানোও এত কঠিন! কী কুক্ষণে যে হেমেনমামাকে কথা দিল অদিতি!

তা লেখা শেষ অবধি বেরোল একটা। বর্ণনায় সংলাপে সেজেগুজে। এবার এটা শোনানো যায় কাকে? লজ্জার মাথা খেয়ে অদিতি স্বামী ছেলেদেরই ধরল শেষমেশ। শুনবে?

মাইকেল চ্যাং সেকেন্ড সেট জিতে গেছে। তৃতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে দুই খেলোয়াড়ের। টুং। টাং। টুং। টাং। টাক্। অদিতির ফ্ল্যাটময় প্রতিধ্বনিত হল স্কোরারের স্বর। ফিফ্‌টিন লাভ্।

অদিতি ফুলস্কেপ কাগজের গোছাটা নিয়ে সোফায় এসে বসল। নিপুণ অভিনেত্রীর মতো মনের ভাব ফুটতে দিচ্ছে না মুখে। একবার সুপ্রতিমকে দেখল, একবার পাপাইকে, একবার তাতাইকে। সামান্য গলা ঝেড়ে বলল,— পড়ব?

—না পড়ে কি ছাড়বে? হা হা করে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল সুপ্রতিম,— পড়ো। পড়েই ফ্যালো।

অদিতি লেখাটা খুলতে যাচ্ছিল, তাতাই বলে উঠল,— এক সেকেন্ড মা। এই গেমটা শেষ হয়ে যাক।

—দেখে নে। অদিতি ওপর ওপর চোখ বোলাচ্ছে প্রথম পাতাটাতে, একবার গুনে দেখে নিল সব পাতা,— বেশি নয়, সওয়া দশ পাতা।

গেমটা ডিউসে চলে গেল। দুই পক্ষ সমান সমান। একবার আগাশির দিকে ঢলে পড়ে, একবার চ্যাং-এর দিকে। অ্যাডভানটেজ আগাশি। ... ডিউস। অ্যাডভানটেজ চ্যাং। ... ডিউস। অ্যাডভানটেজ ... অ্যাডভানটেজ ... অ্যাডভানটেজ ...।

চলছে ... চলছে ... চলছে। এ যেন অদিতির বিজন দুপুর, শেষ আর হয় না।

সুপ্রতিম আড়চোখে দেখে নিল অদিতিকে। নিঃশব্দে হাসছে।

—গেম তো মনে হচ্ছে শেষ হবে না রে।

—এক্ষুনি হয়ে যাবে, তুমি দ্যাখো না।

—অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে রে তাতাই, আমাকে শুতে হবে।

—বাবা প্লিজ ...

আগাশির সার্ভিস গেম ছিনিয়ে নিল চ্যাং। বিপুল করতালি। পাপাই টুক করে উঠে টিভি বন্ধ করে দিল,— পড়ো তো মা। সুপ্রতিম কোলে অ্যাশট্রে টেনে সোফায় হেলান দিল। সিগারেট ধরিয়েছে। বলল,— তোমার হেমেনমামা তা হলে তোমাকে লিখিয়েই ছাড়লেন, কি বলো?

—হ্যাঁ, এমন করে হেমেনমামা বলতে লাগল ...

—কথা তা হলে ভদ্রলোক ভালই বলেন? তোমাকে কনভিন্স করে

ফেলেছেন ? তোমাকে বোঝাতে বেচারা সেলস গার্লগুলোর ঘণ্টা কাবার হয়ে যায় !

—যাহ্, আমি তো ওদের সঙ্গে এমনিই গল্প করি। অদিতির লেখাতেই চোখ এখনও। তুলল চোখ,— হেমেনমামা কী সুন্দর কথা বলে পাপাই জানে। এই পাপাই, বল না।

—বিগ বোর। পাপাইয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

—সে কী রে ! তুই সেদিন অতক্ষণ ধরে ... হেমেনমামা বলল তুই নাকি খুব গল্প করছিলি !

—করছিলাম কোথায় ? শুনছিলাম। শুধু সাহিত্য নিয়ে ভ্যাজারং ভ্যাজারং ! যেন আর কিছু নেই দুনিয়ায় !

—ও। সেকেন্ডের লক্ষ ভগ্নাংশ সময়ে পাপাইয়ের সেদিনের মুখটা মনে পড়ল অদিতির। কী ভালোমানুষের মতো বসেছিল হেমেনমামার সামনে। মনের ভাব লুকোতে এত দক্ষ হয়ে গেছে পাপাই ! একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে অদিতি বলল,— যে যা নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

তাতাই অধৈর্য মুখে বলল,— তোমরা কি শুধু বকবক করবে ? তা হলে আমি টিভিটা চালিয়ে দিই।

—আহ্ তাতাই। কোমল ধমক দিয়ে সুপ্রতিম তাকাল অদিতির দিকে। মোটর রেস স্টার্ট করার ভঙ্গিতে হাতের চেটো দোলালো,— শুরু করো। চালাও।

অদিতি ঈষৎ ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। গুজরাতি চাদর সাপটে নিয়ে আবার গুছিয়ে বসেছে। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল,— পড়ি তবে। গল্পটার নাম ফাটল।

—অ্যাহ্, নামটা ভাল হয়নি। সুপ্রতিম চোখ বুজে টান দিচ্ছে সিগারেটে,— অন্য নাম দাও।

—আহা গল্পটা তো শোনো আগে। দেখবে নামটা গল্পের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।

—কী নাম বললে ? ফাটোল্। ফাআটোল্ ? ছুঁচোল ঠোঁটে তাতাই উচ্চারণ করছে শব্দটা,— তুমি কি আঁতু গল্প লিখেছ নাকি মা ?

—আরে না না, শোন না। ঘরোয়া গল্প।

এবার সত্যি সত্যি পড়তে শুরু করেছে অদিতি। পড়ছে। দুই ভাই বোনের গল্প। দাদার বড় অভাবের সংসার। তার মধ্যে আরও বিপদ, কলতলায় পিছলে পড়ে মাথা ফেটেছে দাদার। অনেকটা পথ উজিয়ে বোন দেখতে গেছে দাদাকে। বহুকাল পর। বোনের অবস্থা বেশ ভাল। বর ডাক্তার, ভাল পশার তার। দাদার বাড়িতে পৌঁছে বোনের হঠাৎ খেয়াল হল, হাতে করে একটু ফল মিষ্টি আনা হল না তো ? এমনই লৌকিকতার সম্পর্ক এখন দাদার সঙ্গে ...

টেলিফোন বাজছে।

মুহূর্তে বাজপাখির মতো উড়ে গেছে পাপাই। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল। মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে বলল,— এক মিনিট মা।

অদিতি হোঁচট খেয়েও হাসল। আলগা মুড়ল গল্পটাকে। ঠিক এই সময়ে প্রায়দিনই পাপাইয়ের ফোন আসছে। একটা মেয়ের ফোন। অদিতি ধরলে মেয়েটা কাঁপা কাঁপা গলায় পাপাইকে ডেকে দিতে বলে, সুপ্রতিম ধরলে কট করে কেটে দেয় লাইন। কলেজের সহপাঠিনী হলে তো এমনটি হওয়ার কথা নয়! পাপাইও চাতকের মতো ফোনের কাছে ঘুরে বেড়ায় এই সময়ে।

ভুরু কপালে তুলে তাতাই প্রশ্ন করল,— আমরা কি দাদার জন্য অপেক্ষা করব?

অদিতি চোখে হাসল,— দাঁড়া, কথা বলে নিক।

—হুঁহ্, দাঁড়িয়েই থাকতে হবে তা হলে।

—ছটফট করছিস কেন? দু-চার মিনিট দ্যাখ।

তাতাই অস্থির মুখে হাতে হাত ঘষছে। ঘাড় উঁচু করে ফোলা গ্ল্যান্ডে আঙুল বোলালো,— চট করে একবার স্কোরটা জেনে নেব? বলেই কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে দৌড়ে টিভিটা চালিয়ে দিল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে খেলা।

পাপাই নিবিষ্ট মনে কথা বলে চলেছে। অত্যন্ত নিচু স্বরে, এত নিচু যে ঠোঁট নড়া ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। ভাবলেশহীন মুখে হঠাৎ হঠাৎ হাসি ফুটে উঠছে পাপাইয়ের। মুছে গিয়েও মুছছে না হাসি, ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট।

সুপ্রতিম আস্তে করে ঠেলল অদিতিকে। চোখের ইশারায় দেখাল পাপাইকে।

অদিতিও চোখে ইঙ্গিত করল, চুপ। তারপর গলা ঝেড়ে বলল,— কেমন লাগছে গল্পটা?

—এখন কি বলা যায়? দেখি, কেমন ভাবে খেলাও।

—না মানে, আরম্ভটা কেমন লাগল?

—মন্দ কি। ভাই ... বোন ... বেশ একটা ফ্যামিলি ড্রামা আছে। টেনশন ফেনশান রেখেছ তো?

—শেষ অবধি শোনোই না।

সুপ্রতিম সেন্টার টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে শেয়ারের পাতায় চলে গেছে। চশমা নেই, চোখের একদম কাছে নিয়ে দেখছে কাগজটা। অদিতি হাতে পেন নিয়ে বসেছিল, তার কাছ থেকে পেনটা নিল। দাগ দিচ্ছে। ভুরুতে ভাঁজ।

আগাশি থার্ড সেট জিতে নিল। গোটা কোর্ট দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাতাইয়ের চোখের মণি খুশিতে উজ্জ্বল। বুড়ো আঙুল দেখাল দাদাকে।

অদিতি অন্তরের উৎসাহটিকে নিবতে দিল না। একটু ঢোক গিলে পাপাইকে ডাকল,—কীরে, তোর হল?

পাপাই হাত তুলল,— এক মিনিট।

সুপ্রতিম হাই তুলে কাগজ রেখে দিল,— তুমি পড়ে ফেলো তো। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

—পাপাই তা হলে শুনবে না ?

—পরে শুনে নেবেখন। নয়তো তোমার মামার কাগজ থেকে পড়ে নেবে।

—ভাল না হলে হেমেনমামা ছাপবে কেন ?

—ছাপবেন না মানে ? তোমাকে দিয়ে লেখালেন ? না না, ঠিক ছেপে দেবেন। নাও, শুরু করে দাও। জলদি জলদি। বললাম না আমাকে কাল সকাল সকাল উঠতে হবে ?

তাতাই করুণ মুখে অদিতিকে বলল,— মা, সাউন্ড অফ করে টিভিটা চালিয়ে রাখলে তোমার পড়তে অসুবিধে হবে ?

—কেন, তোর বুঝি শুনতে ভাল লাগছে না ?

—শুনছি তো। শুনব। চোখ দেখবে, কান শুনবে। দুটো দু কাজের জন্য তৈরি, দুটোকেই সেপারেটলি ফাংশন করানো উচিত। বিশ্বাস না হয়, শেষ করে ধোরো আমাকে। পুরোটা গড়গড় করে বলে দেব।

তাতাই টিভির শব্দ বন্ধ করে এল।

খেলার মূকাভিনয় চলছে পর্দায়। অদিতি গল্প পড়ছে। টেলিফোন কানে দাঁড়িয়ে আছে এক মুগ্ধ শ্রোতা ও কথক। অদিতি পড়ে চলেছে। ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করছে সুপ্রতিম। তাতাইয়ের চোখ টিভি-তে মগ্ন। অদিতি পড়ছে। দুই ভাই-বোনের ভালবাসার গল্প। দুই ভাই-বোনের ভালবাসায় ভাঙন ধরার গল্প। স্বার্থ এসে প্রিয় মানুষকে অচেনা করে দিল। আত্মসুখ পর করল পরস্পরকে। সন্দেহ পাঁচিল তুলে দাঁড়াল। তবু কি কিছু রইল না ... ?

শেষের দিকে এসে অদিতির গলা ধরে আসছিল। উত্তেজনা আর আবেগের এক গাঢ় মিশ্রণে ডুবে যাচ্ছিল সে। যেন তার সামনে অমনোযোগী শ্রোতারা নেই, রঙিন টিভিতে কোনও মরণপণ যুদ্ধ নেই, কেউ শুনছে কি শুনছে না তার পরোয়াও নেই অদিতির।

সে শুধু পড়ছিল।

পাঠ সমাপ্ত। নিজের অজান্তে ভেজা চোখের পাতা মুছে নিল অদিতি। ভারী গলায় বলল,— শেষ।

॥ ছয় ॥

অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করে ডেকে চলেছে পাখিটা। রোজই চেঁচায় আজকাল এই দুপুরবেলায়। অদিতি কাগজ- কলম নিয়ে বসলেই এই এক ঢঙ শুরু করে টিয়া, গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি।

এমনিতে টিয়ার ইদানীং বেশ উন্নতি হয়েছে। হাবে ভাবে চালচলনে মাত্রাছাড়া বুনো স্বভাব কমে এসেছে অনেক। মুখে বুলি ফোটেনি, কিন্তু বাড়ির মানুষদের চিনে গেছে মোটামুটি। সুপ্রতিম কাছে গেলে যেন কিছুই দেখছে না এমন একটা অন্যমনস্ক চোখে লক্ষ করে সুপ্রতিমকে। পাপাই তাতাইকে সামনে দেখলে খানিকটা আত্মরক্ষামূলক আচরণ শুরু করে দেয়, কখনও তাদের মন পাওয়ার জন্য খাঁচাময় ঘুরে ঘুরে নানান কসরত দেখায়। জিমন্যাস্টিক, ট্র্যাপিজ, ব্যাক-ভল্ট। তবে সব থেকে বেশি বুঝি টিয়া অদিতিকেই চিনেছে। অদিতি ছোলা দিতে গেলে আর ক্যাঁ ক্যাঁ করে তেড়ে আসে না, বরং ভারী শান্ত বুঝদার এক ভঙ্গি করে, কখনও বা দাঁড় বেয়ে টুক টুক এগোয় অদিতির দিকে। শুধু এই দুপুরবেলাতেই কেন যে পাখিটা এত জংলি হয়ে যায়!

চৈত্র মাস পড়ে গেছে। রোদ্দুরের তাতও বেড়েছে খুব। ভরদুপুরে ব্যালকনিতে এলে ঝাঁ করে গায়ে হল্‌কা লাগে, যেন অতিকায় এক তোলা উনুন প্রকৃতিময় আঁচ ছড়াচ্ছে। এ বছর এখনও কালবৈশাখী আসেনি, এলে হয়ত তাপ একটু কমত।

অদিতি কলম বন্ধ করে ব্যালকনিতে এল।

ছোট ছোট ঘূর্ণি উঠছে বাতাসে, তিনতলার ব্যালকনিও ভরে গেছে ধুলোয়, মোজাইক মেঝেতে পাউডারের মতো ধুলোর আস্তরণ। কোথ্‌থেকে এক টুকরো সেলোফেন হাওয়ার তাড়া খেয়ে গ্রিল দিয়ে ঢুকে পড়ল। ভাসছে।

ভাসমান সেলোফেনটা খপ্‌ করে মুঠোয় চেপে খাঁচার সামনে দাঁড়াল অদিতি। টিয়ার দিকে ঝুঁকে বলল, —কী রে, চেঁচাস কেন? গরম লাগে?

অদিতির দর্শন পাওয়া মাত্রই টিয়া চুপ। পিট পিট তাকাচ্ছে।

—তোমার মতলব আমি বুঝেছি। সারাটি দুপুর তোমার সামনে আমাকে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাই তো?

টিয়া লাজুক মুখে ঘাড় নামাল।

—ওটি হচ্ছে না বাপধন। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। গল্পটা শেষ করতেই হবে। কাল বাদে পরশু সাহিত্যসভায় নিয়ে যাবে হেমেনমামা। লেখাটা না হলে বুড়োর কাছে কে বকুনি খাবে, তুমি?

গলা দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল টিয়া। কঁক কঁক।

—বায়না করে লাভ নেই। তোমার সঙ্গে মোটেই এখন কথা বলব না।

—কঁক কঁক।

—চোপ্‌। একদম স্পিকটি নট্‌। বলেই সেলোফেনটা গ্রিলের বাইরে ছুড়ে দিল অদিতি। ঘরে ফিরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। হাওয়ায় উড়ছে সেলোফেন, মাটিতে পড়ছে না, ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে বহু দূর।

যাক্‌, যেখানে খুশি ভেসে যাক।

অদিতি ঘরে ফিরে আবার লেখাটা নিয়ে বসল। ঠিক বসল না, উপুড় হয়ে শুল। মাটিতে। বুকের নিচে বালিশ রেখে। খাটে শুয়ে লিখতে পারে না

অদিতি, চেয়ার টেবিলে বসেও না। মাটিতে শরীর ছড়িয়ে দিলে তার মনে হয় লেখার সঙ্গে এক প্রবল শারীরিক ও মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠছে, যেন অদিতি ছুঁতে পারছে লেখাটাকে। তার লিখন ভঙ্গিমাতেও এক ধরনের আবেশ মিশে থাকে। মুখের ওপর ঘন ঘন চুল এসে পড়ে, বুকের আঁচল খসে থাকে মাটিতে, হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা দুটি শূন্যে দোলায় সে। লেখার সময়ে ক্ষণে ক্ষণে তার ভাবপরিবর্তন হতে থাকে। কখনও বা মুখ হাসি হাসি, কখনও ভ্রূ কুঞ্চিত, কখনও বা আপন মনে মুখ বিকৃত করে চলেছে। শেষ বিকেলের আকাশের মতো মুহুর্মুহু অজস্র রঙের ছটা খেলে যায় তার মুখে চোখে। বিড়বিড় করতে করতে কখনও গড়াগড়ি খায়, পরমুহূর্তে লেখায় ফিরে এসে সন্দিগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করে নিজের লেখাকে। এ সময়ে যদি কোনও ভিডিও ক্যামেরায় তার অঙ্গভঙ্গির ছবি তোলা যায়, তবে তাকে নিঃসংশয়ে পাগল প্রমাণ করা যাবে।

সত্যিই এই নির্জন দুপুরে আজকাল পাগলই হয়ে যায় অদিতি। কিংবা পাগলিনী।

অদিতির প্রথম গল্প ফাটল বেরিয়েছে গত মাসে। তার হেমেনমামার পত্রিকায়। গল্প লেখা নিয়ে মনে যে দোলাচল ছিল, তা এখন পুরোপুরি কেটে গেছে অদিতির। তার প্রথম গল্পই বেশ সুনাম অর্জন করেছে। হেমেনের পরিচিতের গণ্ডিটি রীতিমতো বড়, অনেক সমঝদার লোককেই লেখাটি জোর করে পড়িয়েছেন তিনি। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই মতে গল্পটি নাকি কোনও লেখিকার প্রথম প্রকাশিত রচনা বলে মনেই হয় না। ভাষা বেশ পরিণত, অনুভূতির গভীরতা আছে, সব চেয়ে বড় কথা গল্পের শেষে একটি সুন্দর উত্তরণও ঘটেছে। হেমেনের সঙ্গে হেমেনের এক বন্ধু এসে তো খুব পিঠ চাপড়ে গেলেন অদিতির। বহুকাল এমন হৃদয়স্পর্শী গল্প পড়িনি। আপনি এত দিন লেখেননি কেন ? আপনার কাছ থেকে আরও অনেক অনেক ভাল লেখা আমরা আশা করি।

শুনতে শুনতে অদিতির বুক শিরশির করছিল। কদিন ধরে অবিরল ভেবেছে সত্যিই তো কেন এত কাল লেখেনি সে ? সংসারের সুখে মগ্ন থেকেই কি লেখার কথা ভুলে গিয়েছিল ? সত্যিই কি সে সুখী ছিল এতদিন ? আজ কি সে অসুখী ? কিন্তু তা তো নয়। স্বামী ছেলেদের সঙ্গে তুচ্ছ কারণে মনোমালিন্য হয়েছে, বিবাদ ঘটেছে, কখনও কখনও মনঃকষ্টেও ভুগেছে অদিতি, কিন্তু সেগুলোকে তো ঠিক অ-সুখ বলা যায় না। সে তো সাংসারিক জীবনের ছোটখাটো খাঁজখোঁজ, চড়াই উৎরাই, যা না থাকলে জীবনধারণটাই অর্থহীন হয়ে পড়ত। বরং স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, গৃহের লক্ষ্মীশ্রী, সবকিছু মিলিয়ে তাকে সুখী বলাটাই সত্যের অনেক কাছাকাছি হয়। আরও গভীরভাবে ভাবতে গেলে সে বোধহয় সুখী বা অসুখী কোনওটাই ছিল না। মাটিতে জল যেভাবে গড়ায়, সেভাবেই তার জীবনটা গড়িয়ে গেছে। এই প্রবাহ কখন কোন্ মুখী হবে এই

বিষয়ে তার কোনও সচেতন ভূমিকাই নেই। আরও দুঃখের কথা, এই বোধহীন অচৈতন্য স্তরে থাকার বোধটুকুও বুঝি তার ছিল না, তার চিন্তাশক্তিই কেমন যেন ভোঁতা মেরে গিয়েছিল। মনের ভেতর কুয়ো তৈরি করে সেই কুয়োতে ডুবে বসেছিল অদিতি, লেখার জগৎ কি সেখানে রোদ্দুরের ঝলক নিয়ে এল ?

নাকি এ-সব কিছুই নয়, অদিতি একটা খেলনা খুঁজে পেয়েছে? যে সময়টাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল অদিতি, সেই সময়টাকে পার করার একটা বিনোদন পেল আজ ?

নাকি এ সাময়িক নেশা ? ক্ষণিক উত্তেজনা ? হৃদয়ে তরঙ্গ তুলে কদিন আলোড়িত করবে অদিতিকে, আবার এক মোহনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে অদিতি ?

অদিতি জানে না। মনে মনে প্রশ্নগুলোর সমাধানও খুঁজে পায়নি অদিতি। কিন্তু লেখার অভ্যাসটা তার পুরো মাত্রায় ধরে গেছে। সে যে একটা কিছু পারে, একটা বিশেষ কিছু, স্বামী সন্তান সংসার প্রতিপালনের গণ্ডির বাইরেও তার যে এক স্বতন্ত্র গুণ আছে—মনের ভাবকে ভাষার তুলিতে আঁকার ক্ষমতা, এই উপলব্ধি যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে অদিতিকে। বাড়ি ফাঁকা হলেই কাগজ-কলম নিশির ডাকের মতো টানতে থাকে তাকে। আগে নির্জনতায় ছটফট করত অদিতি, এখন নির্জন হওয়ার জন্য সে উতল। প্রতি দুপুরেই মনে হয় কত অজস্র মধ্যাহ্ন অপচয় করেছে সে, আর একটি অলস দুপুরও অদিতি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। অনুভবকে ভাষায় বেঁধে ফেলায় যে এত আনন্দ তা কে জানত !

লিখছে অদিতি।

চৈত্র-দুপুরে ঘরের জানলা সব বন্ধ, টিউবের আলো জ্বলছে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন। অদিতি লিখছে। আলগা কাগজ হাওয়ায় বড় উড়ে যায়, সুপ্রতিমের বালিশ দিয়ে পাতাগুলোকে চেপে রেখেছে অদিতি। আনমনে বালিশটা একটু টানতেই একটা লেখা পাতা ফর্‌র্ করে খাটের নিচে ছুটে গেল। হাঁইহাঁই হামাগুড়ি দিয়ে পাতাটাকে তাড়া করেছে অদিতি।

টেলিফোন। এই সময়েই বাজল ?

খাটের তলা থেকে পাতাটাকে টেনে বার করল অদিতি। বালিশে চাপা দিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ফোন ধরতে ছুটেছে।

সুপ্রতিম।

—কী ব্যাপার, ফোনের পাশে বসেছিলে নাকি ?

—না তো। কেন ?

—না, তোমার ফোন ধরতে অনেক সময় লাগে তো।

—কী বলবে, তাড়াতাড়ি বলো।

—অত তাড়া কীসের ? করছটা কী ? রান্নাবান্না কিছু বসিয়ে এসেছ নাকি ?

—নাহ্।

—বুঝেছি। লিখছিলে। সুপ্রতিম খুক খুক হাসল, —সুখে আছ বটে।

কাজকম্মো নেই, বসে বসে গল্প ফাঁদছ।

অদিতি ধৈর্য হারাচ্ছিল— কী বলবে বলে ফেলো না।

সুপ্রতিম যে কতক্ষণ সময় নিল! বোধহয় কয়েক ঘণ্টা। ঘড়ির হিসেবে কয়েক সেকেন্ড। অবশেষে কাজের কথায় এসেছে, —শোনো, আমাকে আজ বিকেলের স্টিলে জামশেদপুর যেতে হচ্ছে।

—হঠাৎ ?

—কাজ আছে ম্যাডাম। তোমার মতো বসে বসে গপ্পো ফাঁদলে তো আর পেট চলবে না। আমার জামশেদপুর এখনও টার্গেট রিচ করতে পারল না...। সামনেই ইয়ার ক্লোজিং...। লাস্ট টাইমে গিয়ে দেখি, ডিসকাউন্ট ইনসেন্‌টিভ বাড়িয়ে সিচুয়েশানটা যদি ম্যানেজ করা যায়। আমার দুটো ছেলে ওখানে যা ফ্লপ্‌ করে গেছে না...। তুমি চেনো। সেই পুষ্পল আর সমীর। ওদের এগেনস্টে এজেন্টেরও কমপ্লেন আছে। আমি একবার ঘুরে না এলে...

—ফিরছ কবে ?

—আমি ? কথার মাঝে আকস্মিক প্রশ্নে সামান্য থমকেছে সুপ্রতিম, —পসিব্‌লি টুমরো নাইট। কোনও কারণে ফেল করলে ওখান থেকে ফোন করে দেব।

—বাড়ি এসে যাবে তো ?

—তা হলে আর ফোন করছি কেন ? হাতে পাহাড়প্রমাণ কাজ জমে আছে। অফিস থেকেই স্ট্রেট হাওড়া চলে যাব।

এরকম সুপ্রতিম মাঝেমধ্যেই করে থাকে। অফিস থেকেই হঠাৎ হঠাৎ ছোটখাটো ট্যুর। কোনও কোনওদিন এসে বুড়িটা ছুঁয়ে যায়, কখনও কখনও তাও করে না। গত মাসে দুবার অফিস থেকে ভুবনেশ্বর চলে গিয়েছিল। সুপ্রতিমের এই ট্যুর ব্যাপারটা এত নিত্যনৈমিত্তিক, এত গা সওয়া, তবু এখনও প্রতিবারই সুপ্রতিম বাইরে গেলে এক ধরনের উদ্বেগ বোধ করে অদিতি। কিছু খেয়েদেয়ে সুপ্রতিম অসুস্থ হয়ে পড়ল কিনা, টেনশান করে প্রেশার বাড়িয়ে বসল কিনা, লু লাগাল, না সর্দিকাশি বাধাল...। তেমন গভীর কিছু দুশ্চিন্তা নয়, পাপাই তাতাইকে স্কুলে পাঠিয়ে যতটুকু উদ্বিগ্ন থাকত অদিতি, প্রায় সেরকমই। এই মায়াময় উদ্বেগে প্রেমের চেয়ে বাৎসল্যের ভাবই বেশি।

আজ সেটুকুনি উদ্বেগও যেন আসছিল না অদিতির মনে। বরং যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছিল। যাক্‌, দুপুরে শেষ না হলে রাতেও আজ গল্পটা নিয়ে বসা যাবে।

প্রতিবারের মতোই অদিতি বলে উঠল, —সাবধানে যেয়ো। ছাড়ি ?

—ছটফট করছ কেন ? বর বিদেশবিভুঁই-এ চলে যাচ্ছে, দু মিনিট বরের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ?

অদিতি হেসে ফেলল,— জামশেদপুর কবে থেকে তোমার কাছে বিদেশবিভুঁই হল ? তুমিই তো বলো ভুবনেশ্বর জামশেদপুর যাওয়া আমাদের

আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি যাওয়ার থেকে সোজা।

—ওই হল। গৃহসুখ তো আর সেখানে নেই। সুপ্রতিম কথা বাড়িয়েই চলেছে,— তারপর ? কী লিখছ আজ ?

খুবই সাধারণ প্রশ্ন, হাল্‌কা জিজ্ঞাসা, তবু ঘরের মানুষের আগ্রহে একটু নাড়া খেল অদিতি। খুশিও হল কি ! বলল, —ওই হেমেনমামাদের সাহিত্যসভায় একটা গল্প পড়তে হবে, সেটাই...

—ভাল। লেখো। বাই দা ওয়ে, এবার কাকে ধরেছ ?

—মানে ?

—বাহ্, আগের গল্পে তোমার দাদাকে তুমি জব্বর টাইট দাওনি ? ভুলিয়ে ভালিয়ে বোনকে ঠকিয়ে নিয়েছে দাদা, বোন খুব দুঃখ পেয়েছে...ঠিকই লিখেছ। উচিত কথাটা লেখার দরকার ছিল।

অদিতি নীরব। সুপ্রতিমের বদ্ধমূল ধারণা, গল্পটা অলকেশকে নিয়েই লেখা। কিছুতেই তাকে বোঝানো যায়নি ওটা শুধু অদিতি অলকেশের কথা নয়, ভাই বোনের চিরন্তন সম্পর্কের কাহিনী। যে সম্পর্ক সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিতে বিষিয়ে যায়, কিন্তু মরে না, চিড় ধরে যাওয়া সম্পর্কেও কোথায় যেন একটা চোরা টান থেকেই যায়, ফল্গুনদীর মতো বইতে থাকে হৃদয়ে। গল্পের দাদা ঘুড়ি ওড়ালে বোন লাটাই ধরে থাকত, জিত্‌তাল খেলে জেতা গুলি বোনের কাছে জমা রাখত দাদা—এ-সব তো অদিতির জীবনে সত্যি নয়। আসলে বোধহয় গল্পটা থেকে ওইটুকুই রস পেয়েছে সুপ্রতিম। মাঝখান থেকে সুপ্রতিমের কথা শুনতে শুনতে অদিতির মনেও কেমন দ্বিধা এসে গেল, কিছুতেই গল্পটা তুলতুলিকে পড়াতে পারল না। অদিতি এতদিন পর আবার গল্প লিখেছে শুনে অলকেশও কী খুশি, পত্রিকাটা চেয়েও পাঠিয়েছিল, অদিতি বেমালুম বলে দিল হারিয়ে গেছে ! তাতেই যেন সুপ্রতিম আরও মজা পেয়ে গেল।

সুপ্রতিম অদিতির নীরবতার তোয়াক্কা করল না। হাসছে, —দাদার নামটাও বেড়ে দিয়েছিলে। রামকৃষ্ণ। বিষয়জ্ঞান টনটনে, কিন্তু মুখে কত দরদ !

অদিতি রুক্ষভাবেই বলল, —তোমার হাতে অনেক কাজ জমে আছে বলছিলে না ?

—দাদার কথায় গায়ে ফোস্‌কা পড়ছে ? হা হা। ঠিক আছে, রাখলাম।

টেলিফোন যথাস্থানে রেখে কয়েক পল স্থির দাঁড়িয়ে রইল অদিতি। তারপর শিথিল পায়ে ফ্রিজের সামনে এল, বোতল খুলে ঢকঢক ঠাণ্ডা জল ঢালল গলায়, ঘাড়ে মুখে শীতল জলের ছোঁয়া দিল। ফোন ধরতে এসে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেছে, বাঁধতে সময় লাগবে। অস্থির পায়ে ড্রয়িংস্পেসে খানিক পায়চারি করল অদিতি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

বেলা গড়িয়েছে। পায়ে পায়ে পিছু হঠছে রোদ্দুর। কম্পাউন্ডে ছায়া। আশপাশের ফ্ল্যাটের কয়েকটি মেয়ে এই মাত্র কলকল করতে করতে স্কুল থেকে

ফিরল, ঘাসজমিতে জড়ো হয়ে হিহি হাহা করছে। শিপ্রার শাশুড়ি শীর্ণ শরীরে চৈত্রের তাপ নিচ্ছে। গেটের গুলমোহর গাছে ফুলেরা দুলছিল। টিয়া ঘাড় গুঁজেছে পিঠে। ঘুমোচ্ছে। শেষ দুপুরেই।

গল্পটা নিয়েই ভাবার চেষ্টা করছিল অদিতি। মনের ভেতর এক আজব কাটাকুটি খেলা চলছে।

...ভাড়া বাড়ি বদলাতে বদলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এক মধ্যবিত্ত দম্পতি। কোথাও দু বছর গেলেই জল নিয়ে ঝামেলা শুরু করে বাড়িঅলা, কোথাও দেওয়ালে একটা পেরেক ঠুকলে বাড়ির মালিক হাঁ হাঁ করে ওঠে, কোথাও ফিরতে একটু রাত হলে ঠারেঠোরে কথা শোনায়, কোথাও বা বেশি দিন থাকতে চাইলেই উঠে যাওয়ার হুকুম জারি হয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে নির্বিরোধী দম্পতি নিজস্ব একটা আস্তানার জন্য মরিয়া, গেছে এক প্রোমোটারের কাছে, যদি কোনওভাবে ছোটখাটো ফ্ল্যাট কিনে ফেলা যায়। দুটো নেকড়েসদৃশ অ্যালসেশিয়ান দু পাশে নিয়ে বসে আছে প্রোমোটার, মুখে তার বরাভয়। ডোন্ট ওরি, আপনাদের বাজেটের মধ্যে তৈরি করে দেব। উইদিন টুয়েলভ্ মানথস্। সঞ্চয় উজাড় করে ফ্ল্যাট বুক করল আশা আর পরেশ। পরেশের অফিস থেকে লোন, আশার গয়না বিক্রি, কোঅপারেটিভ থেকে দেনা—প্রাণপণে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে দুজনে। বাড়ি শুরু হল। দিন যায়, মাস যায়, দুজনে রোজ একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসে নির্মাণ। বাড়ি উঠছে। নিজস্ব আশ্রয়ে যাওয়ার স্বপ্নে আশা পরেশ বিভোর। মনোমতো ঘর সাজানোর স্বপ্নে স্বামী-স্ত্রী মশগুল। খাঁচা ঢালাই হয়ে হঠাৎ বাড়ির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। করপোরেশান কী ঝামেলা করেছে। এক বছর গেল, দেড় বছর গেল, আশা পরেশের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। দু বছরের মাথায় আবার শুরু হয়েছে কাজ। নতুন করে আশা ফুটছে স্বামী-স্ত্রীর। ঠিক তখনই প্রোমোটারের ভাষা বদলে গেল। ও দরে আর পারব না দাদা। লাখখানেক বেশি লাগবে। লোন চান তো বলুন দিয়ে দিচ্ছি। টোয়েন্টি পারসেন্ট ইন্টারেস্ট। শোধ করে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে নেবেন। আশা পরেশের মাথায় হাত। ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তারা, আরও ধার করলে ছেলেমেয়ে নিয়ে খাবে কী ? আশা পরেশ এখন কী যে করে ? আরও ধার বাড়াবে ? প্রোমোটারের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নেবে ? আবার সেই হীনম্মন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা ? অন্যের বাড়িতে ? মুখ গুজে ? মুখ শুনে ?...

পাশের ফ্ল্যাটের কল্যাণী জল দিচ্ছে টবে। বারান্দার বাগানের পরিচর্যা থামিয়ে ডাকছে অদিতিকে, —কী দিদি, আজকাল যে আপনার দেখাই পাওয়া যায় না ?

আশা পরেশের সমস্যায় অদিতি গভীর চিন্তামগ্ন। নিরুত্তর।

কল্যাণী আবার ডাকল, —আপনার শরীর খারাপ নাকি দিদি ?

বিমনা অদিতি ফিরেছে এবার। আলতো ঘাড় নাড়ল। না।

—পাপাইয়ের পার্ট টু তো এসে গেল, তাই না ?

—হুঁ।

—কবে থেকে শুরু ?

অদিতি চট করে মনে করতে পারল না। আজ কত তারিখ ? এটা যেন কী মাস ? নিজেতে ফিরতে কয়েক লহমা সময় লাগল অদিতির। সামান্য গলা তুলে বলল, —এখনও মাস দেড়েক বাকি। মে-র গোড়াতে শুরু হবে।

—বেশ মজা আপনার। দুটো ছেলেই বড় হয়ে গেল। আমার ওই গুণ্ডাটা যে কবে মানুষ হবে ! ছেলের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে জান বেরিয়ে গেল।

—সামনের বার মাধ্যমিকটা দিক, দেখবেন হু-হু করে সময় চলে যাবে। অদিতি ছোট্ট করে হাসল।

স্তোকবাক্যটা যেন ঠিক কানে গেল না কল্যাণীর। গ্রিলের কিনারে এসে গলা নামিয়েছে, —কাল রাত্তিরে গোপাদের ফ্ল্যাটের হল্লা শুনেছিলেন ?

অদিতির ক্ষীণ মনে পড়ল দোতলায় কাল একটা গণ্ডগোল হচ্ছিল বটে। অদিতিরা তখন খেতে বসেছে। কী একটা যেন চটুল মন্তব্যও করেছিল সুপ্রতিম ! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সুপ্রতিম বলছিল, ওই আবার গানবাজনা শুরু হল। সুপ্রতিম কথাটা বলল, না তাতাই ?

অদিতি নির্লিপ্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —কী হয়েছিল ?

—ওমা জানেন না ? গোপা তো বরের অফিসে গিয়ে বরের এগেনস্টে কমপ্লেন করে এসেছে। সিদ্ধার্থবাবু নাকি সংসারে টাকাপয়সা দেয় না, সেই মহিলাকে সব দিয়ে আসে। সেই যে যার সঙ্গে এখন চলছে। কল্যাণী ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপল, —মেয়েছেলেটার নাকি খুব খাঁই।

কল্যাণীর কথা থেকে মনকে বিযুক্ত করার চেষ্টা করল অদিতি। পরেশরা যদি প্রোমোটারের কাছ থেকে টাকা ফেরত চায়ও, প্রোমোটার কি সহজে ফেরত দেবে ? অদিতিদের এই ফ্ল্যাট কেনার সময়ও কী কম টালবাহানা হয়েছিল ? গোড়ায় বলল আড়াই লাখ, বাড়তে বাড়তে সওয়া তিন। তবে সে টাকা জোগাড় করেছিল সুপ্রতিম। দুটো ইনসিওরেন্সের পলিসি বাঁধা রেখে। তাতেও কুলোয়নি, বড় ভগ্নীপতির কাছ থেকে বেশ কিছু ধার নিয়েছিল। পরেশের কি সেরকমও কেউ নেই ?

অদিতির নীরবতা কল্যাণীকে দমাতে পারেনি। প্রবল উৎসাহে ফিসফিস করে চলেছে, —গোপা সিদ্ধার্থবাবুর অফিসে গিয়েছিল বলেই তো ফাটাফাটি।

—যাওয়াই তো উচিত। ঠিক করেছে। অদিতি মুখ ফসকে বলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নিয়েছে কল্যাণী, —উচিত তো বলছেন, গোপাকে কে মদত দিচ্ছে জানেন ? ওই যে লোকটা আসে ওদের বাড়িতে...গোপা বলে ওর মামাতো ভাই...। কাল তো ওকে নিয়েও যাচ্ছেতাই কথা বলছিল সিদ্ধার্থবাবু। কল্যাণী নীচের ফ্ল্যাটের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন, আরও অনুচ্চ

স্বরে বলল, —ওটা নাকি সত্যি সত্যি মামাতো ভাই নয়, মামার বন্ধুর ছেলে। গোপার নাকি বিয়ের আগে তার সঙ্গে একটা ইয়ে ছিল। রোজ রোজ বাড়িতে বউয়ের প্রেমিক এসে বসে থাকলে কোন্ পুরুষের বউতে মন থাকে ? আমার কর্তা তো শুনে ফায়ার হয়ে গেছে। বলছিল এরকম বস্তিবাড়ির দশা চললে ফ্ল্যাট বেচে চলে যাব। ওদের ছেলেপিলেরা কী দেখছে বলুন তো ? ছি ছি...

অদিতির এ-সব কেচ্ছাকাহিনী শুনতে ভাল লাগে না, আজও লাগছিল না। আশা পরেশকে বিপদসাগরে ফেলে সে এখন হাঁসফাঁস করছে।

সহসা মুক্তিদূতের মতো ডোরবেল বেজে উঠেছে। মলিনার মা।

বাসন মাজতে এসে বিকেলের দিকে রাজ্যের গল্প জোড়ে মলিনার মা। কোনও কোনওদিন মন দিয়ে শোনে অদিতি, আজ চটপট ভাগিয়ে দিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে, এক কাপ চা করে খেল আগে। আবার লেখাটা নিয়ে বসেছে। সবিতা আসার আগে দু-চার লাইন যদি আরও লিখে ফেলা যায়।

পারল না। সবিতার আগে আজ পাপাই এসে গেছে। পিছন পিছন তাতাইও। পাপাই জলখাবার খেয়ে শুয়ে পড়ল, রাত নটায় তাকে ডেকে দিতে হবে। তাতাই বসে গেল টিভিতে।

অদিতি ছটফট করছিল। ছেলেরা বাড়ি থাকলে এত ভাল লাগে তার, আজ কেন অসহ্য লাগছে ? মাথার ভেতর গুবরে পোকার মতো ঘুরছে গল্পটা, তাই কি ? তাতাই সন্ধেবেলা বাড়ি থাকলে অদিতির কি একটুও সুস্থিত থাকার জো আছে ? পরের পর হুকুম চলছে তাতাইয়ের। পিৎজা ব্রেড এনে দিচ্ছি, একটু চিজ্ পিৎজা করে দাও না মা। উফ্ কী গরম লাগছে, মা একটু শরবত করে দেবে ? ওকী, শুধু ঠাণ্ডা জলে করছ কেন, দু-চারটে আইসকিউব ফেলে দাও। অদিতি একবার বলেই ফেলল, তোর সাঙ্গোপাঙ্গরা আজ তোকে পরিত্যাগ করল নাকি ! শুনে ছেলের কী হাসি। নো ডিয়ার মাম্মি, চিরন্তন মজুমদারই আজ সবাইকে ছুট্টি দিয়েছে। আজ আমি মাথাটাকে একটু রেস্ট দিচ্ছি।

আজই ? কেন ?

অনেক রাতে, পাড়া যখন নিশুত, সংসার থেকে পুরোপুরি ছাড়ান পেল অদিতি। একা ঘরে দরজা বন্ধ করে আবার আশা পরেশ। টাকাটা যদি প্রোমোটার ফেরত দিয়েই দেয়, পরেশ কী করবে ? আরেকটু ছোট ফ্ল্যাটের জন্য চেষ্টা চালাবে কোথাও ? মানুষের স্বপ্ন কি সম্পূর্ণ সফল হয় কখনও ? তার চেয়ে স্বপ্নটাকেই যদি ছেঁটেকেটে ছোট করে নেওয়া যায়, যদি সেটাকেই মানুষ রাঙিয়ে নিতে পারে, তা হলে কি... ?

নাহ্, গোছানো যাচ্ছে না। দুপুরে সুপ্রতিমের ফোনটা আসার পর থেকেই গল্পটার যেন খেই হারিয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল অদিতি, ঘুম আসে না। জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে অদিতি, ঘুম আসে না। ছোট্ট একটা ঝড় উঠে রাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, অদিতির ঘুম আসে না। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে অদিতির, ঘুম

আসে না।

নীল অন্ধকারে জেগে আছে অদিতি। গল্পের শেষটুকু চাই। মস্তিষ্ক অদৃশ্য আঁকিবুকি কেটে চলেছে শূন্যে। শেষটুকু চাই। শেষটুকু।

॥ সাত ॥

হেমেন এলেন পাঁচটা নাগাদ। অদিতি তখন বিকেলের চা করছিল। সকাল থেকে বুকের ভেতর যে সূক্ষ্ম কম্পন চলেছে, হেমেনকে দেখেই তা বেড়ে গেল সহস্রগুণ। জীবনে প্রথম কোনও সাহিত্যসভায় যাবে অদিতি, একরাশ অচেনা মানুষের সামনে বসে নিজের লেখা গল্প পড়বে—ভাবনাটা অদিতির পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটাকে কেমন টলমলে করে দিচ্ছিল। একুশ বছরের তরুণীর পক্ষে বয়সের প্রখর তেজে যা অনায়াসসাধ্য, অদিতির মতো আটপৌরে গৃহবধূর পক্ষে তা কি চরম বেমানান নয়? হঠাৎ ঝোঁকের বশে হেমেনমামার কথায় রাজি হয়ে গিয়ে কি ভুল করল অদিতি?

হেমেন আজ বেশ সেজেগুজে এসেছেন। পাটভাঙা ধুতি, মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। কুঁজোটে বৃদ্ধ চেহারা আজ অনেক ঋজু, টানটান। তোবড়ানো গালেও চকচকে আভা।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই তাড়াহুড়ো শুরু করে দিয়েছেন হেমেন, —কী হল, তুমি এখনও তৈরি হওনি?

অদিতি কাঁচুমাচু মুখে বলল, —না গেলে হয় না হেমেনমামা?

—কেন, তোমার কি গল্প লেখা হয়নি?

—তা কোনও মতে একটা খাড়া করেছি...

—বাড়িতে কোনও বিশেষ কাজ আছে?

—তাও ঠিক নয়...অদিতি অসহায় চোখে সুপ্রতিমের দিকে তাকাল, —অ্যাই, তুমি বলো না...

রবিবারের বিকেল। সোফায় গা ছড়িয়ে আয়েশ করে চা খাচ্ছিল সুপ্রতিম। হেমেনকে দেখে পা নামিয়েছে। বলল, —আপনার ভাগ্নী আজ সকাল থেকে হরিনাম জপ করছে। ও বাবা গো, কী হবে গো, সবাই মিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে গো...

—আমি কি তাই বলেছি? লঘু প্রতিবাদ করল অদিতি—এত বছর ধরে ঘরসংসার করছি...যাওয়ার মধ্যে যাওয়া আত্মীয়দের বাড়ি, নয় তোমার কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি...এরকম জায়গায় আগে গিয়েছি কখনও?

—তা বললে চলবে কেন, অ্যাঁ? তুমি এখন লেখিকা হতে চাইছ, এ-সব গ্যাদারিং-এ তো তোমাকে যেতেই হবে। যে লাইনের যা নিয়ম। সব কিছুর তো একটা চ্যানেল চাই। সুপ্রতিম শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালা-পিরিচ সেন্টার টেবিলে রাখল, —বুঝলেন মামা, আমি যখন প্রথম সেলস লাইনে আসি,

থোড়াই তখন এ লাইনের ঘাঁতঘোত জানতাম। ছোট্ট একটা কোম্পানিতে ঢুকেছি, ট্রেনিং বলে কিস্যু নেই, চোখে অন্ধকার দেখছি।...সেই সময়ে লাইনের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে আলাপ। রোজ সন্ধেবেলা দল বেঁধে আমরা ডেকার্স লেনে বসতাম। সেই গ্যাদারিং থেকেই আমার শিক্ষা, সেই গ্যাদারিং-এই আমার কাজকর্মে হাতেখড়ি। লাইনে সাকসেসফুল হতে গেলে মিক্সিং ইজ মাস্ট। দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে...কি বলেন মামা ?

সুপ্রতিমের কথায় এমন এক সহজ কর্তৃত্বের সুর থাকে যার প্রতিবাদ করা কঠিন। যেন সে যা বলছে, তাই পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য। তেল সাবান বেচা আর সাহিত্য করার মধ্যে যে আদতে কোনও ফারাক নেই, এ কথা তুড়ি মেরে যাকে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারে সুপ্রতিম।

হেমেন চায়ের কাপ হাতে হাসছেন মৃদু মৃদু। অদিতিকে বললেন, —এরকম একজন উৎসাহী স্বামী পেয়েছ, তোমাকে এত প্রেরণা দেয়, তোমার তো গর্বিত হওয়া উচিত অদিতি।

—আপনি আমাকে আর লজ্জা দেবেন না মামা। যদ্দিন জানতাম না, জানতাম না। এখন অ্যাদ্দিন পর যখন একটা গুণ বেরিয়েই পড়েছে, কেন আমি প্যাট্রোনাইজ করব না ? আফটার অল সবার বউ তো আর লেখিকা হয় না ! এই তো, আজ সন্ধেবেলাতেই আমার এক বন্ধু বউ নিয়ে আসতে চাইছিল। আমি স্ট্রেট বলে দিলাম, আজ এসো না ভাই, আজ আমার বউ সাহিত্যসভায় যাবে।

হেমেন বললেন, —এর পরও তুমি এখনও তৈরি হওনি ? যাও যাও। আমাদের কিন্তু ঠিক ছ'টায় পৌঁছতে হবে।

অদিতি ঘরে এসে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসল। সুপ্রতিম সত্যিই বড় সাদা মনের মানুষ। মালিন্যহীন। সঙ্কীর্ণতাবিহীন। এই বয়সে অদিতিকে হঠাৎ লেখায় পেয়ে বসল বলে রঙ্গরসিকতা করে ঠিকই, আবার পাঁচজনের কাছে স্ত্রীর কথা গর্ব করে বলতেও ছাড়ে না। গত রবিবার কস্তুরীরা কর্তাগিন্নি এসেছিল এ বাড়ি, তাদের পত্রিকা দেখিয়ে অদিতির গল্প পড়িয়ে কী হইচই না শুরু করল সুপ্রতিম ! দেখেছ ছেলেরা বড় হয়ে গেছে বলে আমার বউ শুয়ে বসে সময় কাটায় না ! কী ফাইন একটা পাসটাইম খুঁজে নিয়েছে !

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছে সুপ্রতিম। হেমেনমামার ভারী কণ্ঠস্বরও শোনা যায় মাঝে মাঝে। কী যে বিষয় তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে সুপ্রতিম আর হেমেনমামা কথা শুরু করলে বিষয়ের স্থিরতাও থাকে না, অনবরত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় দুজনে। সুপ্রতিমই অবশ্য কথা বলে বেশি।

অদিতি দ্রুত হাতে অল্প প্রসাধন সেরে নিল। তার ত্বক একদম গরম সহ্য করতে পারে না, এখনই দু-চারটে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে। ঘাড়ে গলায় আলগা পাউডার বোলালো অদিতি, মুছেও নিল। ছোট্ট একটা টিপ কপালে লাগাতে লাগাতে গলা ওঠাল একটু, —এই, একবার শুনে যাও তো।

সুপ্রতিম তক্ষুনি এল না, এল মিনিট দু-তিন পরে, —কী বলছিলে ?

অদিতি ঢোক গিলে বলল, —তুমি আমার সঙ্গে চলো না।

—আমি গিয়ে কী করব ?

—বাড়িতে বসে থেকেই বা কী করবে ? গেলে কত নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হত। সুপ্রতিমের দিকে ঘুরল অদিতি, —তুমি গেলে আমিও একটু ভরসা পেতাম।

সুপ্রতিম হেসে ফেলল, —মামার ওপর ভরসা হচ্ছে না ?

—তা নয়, তুমি থাকলে...

—না রে ভাই, সভাটভায় যাওয়া আমার পোষাবে না। ভাবছি একটু দীপকের কাছ থেকে ঘুরে আসি। ...তুমি ফিরছ কখন ?

—হেমেনমামা যখন ফেরত আনবেন। অদিতি ছোট শ্বাস ফেলল।

—বেশি রাত কোরো না। পাপাই তাতাই ফিরে আসবে...আমি থাকব না...। রোববার বলে আবার বাসফাসের ধান্দা কোরো না যেন। ট্যাক্সিতে যাতায়াত কোরো। টাকা আছে কাছে, না দিয়ে দেব ?

—আছে। অদিতি ইতস্তত করে বলল, —হেমেনমামা কি আমাকে ভাড়া দিতে দেবেন ? মাঝখান থেকে ওঁরই গাঁটগচ্চা।

সুপ্রতিম দরজায় উঁকি দিয়ে ড্রয়িংস্পেসটা দেখে নিল একবার। রবিবারে এ বাড়িতে একটা করে বাংলা কাগজ আসে, হেমেন কাগজের ক্রোড়পত্র পড়ছেন। মুখ ফিরিয়ে খুক খুক হাসল সুপ্রতিম। গলা নামিয়ে বলল, —আরে না না, উনি দেবেন কেন ? রিটায়ার্ড মানুষ...তুমি একজন সলভেন্ট ভাগ্নী...। তা ছাড়া...

—তা ছাড়া কী ?

—পুরুষমানুষের অনেক সিক্রেটই তুমি জানো না ম্যাডাম। বেশি মাঞ্জা দেওয়া লোকেদের পকেটে মালকড়ি থাকে না। তুমি ভাড়া দিলে মামা বর্তে যাবে।

—শুধু ফাজলামি। শুধু ফাজলামি। অদিতি আলমারি খুলল, —কী শাড়ি পরা যায় বলো তো ?

সুপ্রতিম ওয়ার্ড্রোবে চোখ বোলালো। আঙুল নেড়ে বলল, —ওই বটল গ্রিন সিল্ক কলাক্ষেত্রমটা পরো।

—এই গরমে সিল্ক ! ওই গরজাস শাড়ি ! বিয়েবাড়ি যাচ্ছি নাকি ?

—তো কী হয়েছে ? একটা জায়গায় প্রথম যাচ্ছ, একটু তো সেজেগুজে যাওয়াই ভাল। লেখিকার গ্লেজ দেখে পাবলিক চমকে যাবে।

—থাক, অত চমকিয়ে লাভ নেই। কী কপালে আছে কে জানে। অদিতি একটা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি বার করল, —গরমের দিনে এই ভাল, কি বলো ?

সুপ্রতিম নাক কুঁচকেছে, —বেশি যোগিনী যোগিনী হয়ে যাচ্ছে না ?

—এখন যোগিনী সাজারই বয়স। রাধিকা সাজার বয়স নয়।

—নিজের পছন্দমতোই সাজবে যখন, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ?

সুপ্রতিম ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অদিতি আবার ডাকল, —তুমি হঠাৎ আজ দীপকদার বাড়ি যাচ্ছ ?

—যাই। বেচারা একা একা আছে।

দরজা ভেজিয়ে শাড়ি পরছে অদিতি। আঁচল কাঁধে ছুড়ে বলল, —শর্মিলা কি একেবারেই চলে গেল ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—ছেলেটাও দীপকদার কাছে আসে না ?

—ওই নিয়েই তো ঝামেলা। শর্মিলা নাকি ছেলেমেয়েদের আসতে দেয় না। শুনলে না সোমেন বলছিল দীপক খেপে ফিউরিয়াস হয়ে আছে।

—আর মদ গিলছে।

—মানুষকে তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, নাকি ? পুরুষ মানুষ হয়ে লোকের কাছে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে ? কোর্টে গেলে তখন শর্মিলা টাইট হবে। অত অ্যাডামেন্ট অ্যাটিচিউড...

শর্মিলার মতো শান্ত ধীর স্থির মেয়েকে একগুঁয়ে ভাবতে অসুবিধা হয় অদিতির। তবে এই মুহূর্তে শর্মিলাকে নিয়ে সে তেমন ভাবছিলও না। যেন সুপ্রতিমের সঙ্গে কথা বলে বলে নিজেকে সহজ করতে চাইছিল। কুঁচি কোমরে গুঁজে বলল, —দীপকদা দেবদাস হয়েছে বলে তুমি যেন আবার চুনীলাল হতে যেয়ো না।

সুপ্রতিম সশব্দে হেসে উঠল, —আরে বাবা, দীপক একাই দেবদাস হতে পারে, ওর জন্য চুনীলাল লাগে না।

গম্ভীর মুখে অদিতি বলল, —কথাটা কেন বলেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ?

—আরে বাবা হ্যাঁ। তুমি ঠোঁট নাড়লে তোমার পেটের কথা আমি টের পেয়ে যাই।

—কথাটা মনে রেখো। ওখানে গিয়ে গ্লাস নিয়ে বসে যেয়ো না।

সুপ্রতিম হঠাৎ যেন তেতে গেল একটু, —তুমি আমাকে কী মনে করো বলো তো ? বাড়িতে তো বোতল রাখাই থাকে ! পাপাই তাতাই এখন যথেষ্ট ম্যাচিয়োর হয়ে গেছে, ওরা কিছু মনেও করবে না, তা বলে কি আমি গেলাস নিয়ে বসি রোজ ?

অদিতি কথা বাড়াল না। যা ইচ্ছে করুক। নিজের শরীর নিজে বুঝবে। গত বছর যখন বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা বলে সাতদিন বাড়িতে শুয়েছিল, তখন ডাক্তারের সতর্কবাণী শোনেনি ! হার্ট-ফার্ট নিয়ে প্রবলেম নেই, কিন্তু বয়সটা আপনার ভাল নয় মিস্টার মজুমদার ! বুজিং স্মোকিং সবই এখন কন্ট্রোল করার সময় ! সুপ্রতিম বাড়াবাড়ি করে না ঠিকই, রোজ পান করাও তার অভ্যাস নয়, তবু এক-আধদিন তো মাত্রা ছাড়ায়ই। অদিতি আর কত খ্যাচখ্যাচ করবে !

আকাশে অল্প মেঘ করেছে। কালও করেছিল, তবে বৃষ্টি হয়নি। অস্তগামী সূর্য ঈষৎ ম্রিয়মাণ হলেও তার তাপ এখনও প্রবল। সিমেন্ট পিচ ইট লোহার অরণ্য উত্তাপ বিকিরণ করে চলেছে। সন্ধে নামলে মলয় বাতাস উঠবে একটা, তবে তার এখনও সময় হয়নি।

সাহিত্যসভায় পৌঁছে অদিতি বিস্মিত হল। সভা বলতে তার চোখে যে এক মহতী ছবি আঁকা ছিল, এ তো সেরকম কিছু নয়! চারু মার্কেটের পিছনে একটা পুরনো দোতলা বাড়ির একতলার বৈঠকখানা ঘরে ফরাস পাতা হয়েছে, জনা দশ-বারো মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন সেখানে, পরস্পরের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। কোনও নামী সাহিত্যিক তো নেইই, বরং যাঁরা বসে আছেন তাঁদের দেখে লেকের বয়স্ক আড্ডাবাজদের উপমাই মনে আসে। প্রৌঢ়দের মাঝে দুটি মাত্র কমবয়সী ছেলে. তারা অবশ্য বসে নেই, রীতিমতো ব্যস্ত-মুখে মাঝে মাঝে ঘর-বার করছে। হেমেনমামা বলেই ছিল খুবই ছোট ব্যাপার, কিন্তু এ যে নিছকই ঘরোয়া আড্ডাখানা!

হেমেন একে একে সকলের সঙ্গে অদিতির পরিচয় করিয়ে দিলেন। কেউ পেশায় শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক, কেউ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, কেউ গ্রন্থাগারিক। একজন ওষুধ দোকানের মালিকও আছেন। এঁদের মধ্যে দু-তিনজন অদিতির ফাটল গল্পটি পড়েছেন, আলাপের সময়ে সংক্ষিপ্ত প্রশংসাসূচক মন্তব্যও করলেন তাঁরা। একজন বললেন ফাটলের লেখিকাকে আরও প্রবীণা ভেবেছিলেন তিনি, আরেকজনের মুখ দেখে মনে হল অদিতি আরেকটু তরুণী হলে তিনি যেন খুশি হতেন।

এক বয়স্কা মহিলা, সম্ভবত এ বাড়ির কোনও গৃহিণী, হাত ধরে বসালেন অদিতিকে। তিনিও অদিতির গল্পটি পড়েছেন, অদিতি যে নতুন গল্প লেখা শুরু করেছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করার ফাঁকে অদিতির স্বামী পুত্র সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে নিলেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল আরও দুজন মহিলার আজ আসার কথা ছিল, দুজনেই শিক্ষিকা।

অদিতির জড়তা কেটে যাচ্ছিল। কৌতূহলী কানে শুনছিল চারদিকের টুকরো-টাকরা সংলাপ। হেমেন প্রৌঢ়দের মধ্যমণি হয়ে বসে গেছেন, তিনি এখানে বেশ জনপ্রিয় বোঝা যায়, অনেকের সঙ্গেই নিজের পত্রিকা নিয়ে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কয়েকজন প্রখ্যাত লেখকের কথাও উঠে পড়ছে, বাংলা সাহিত্যের যে এখন বেশ বেহাল অবস্থা সে সম্পর্কেও তর্ক চলছে জোর। নব্য প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে বাংলা পড়ে না তাই নিয়েও অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ। টিভির অপকারিতা সম্পর্কেও সরব অনেকে।

অদিতি এক প্রান্তে বসে আছে। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। প্রৌঢ় গ্রন্থাগারিকটি আড্ডা ছেড়ে সেখানে এসে বসলেন। হয়তো অদিতিকে একা দেখেই। আলাপ জমালেন, —কী, আমাদের এই পরিবেশটা কেমন লাগছে?

অদিতি স্মিত মুখে বলল, —ভালই তো।

—অন্য সভার থেকে এটা অনেক ঘরোয়া না ?

বাজারে সবজিঅলা নিজের কুমড়োর প্রশংসা করলে অদিতি যেভাবে হাসে, হুবহু সেই হাসি হাসল, —হুঁ। তা বটে। খুব হোমলি।

—আমাদের প্রেমতোষদা সেটাই চান। ওঁর মতে সভা হবে ঘরোয়া, আলোচনা হবে তীক্ষ্ণ। এতেই বেশ গল্পের আসরের মেজাজ আসে। আমাদের এখানে তাই কোনও রাখঢাক গুড়গুড় নেই, যার যা খুশি বলে ফেলতে পারে।

প্রেমতোষ নামটা অদিতির পরিচিত। হেমেনমামার মুখেই শোনা। ভদ্রলোকের নব্বইয়ের ঘরে বয়স, এখনও নাকি যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পেশায় কবিরাজ, এখনও দু বেলা চেম্বারে বসেন। নেশা হল এই সাহিত্য। নিজে লেখেন না, কিন্তু লেখার একজন প্রকৃত সমঝদার। তিনিই এ বাড়ির মালিক।

অদিতি প্রশ্ন করল, —তাঁকে তো দেখছি না ?

—ওপরেই আছেন, এখুনি এসে পড়বেন। স্ত্রীর অসুখটা খুব বেড়েছে, তাই নামতে একটু দেরি হচ্ছে।

—কী হয়েছে ?

—বহুকাল ধরেই ভুগছেন। প্রায় তিন বছর। ক্যানসার।

ক্যানসার ! অদিতি হতভম্ব হয়ে গেল। কই, হেমেনমামা তো একবারও বলেনি সে কথা ! হ্যাঁ, আগের দিন বলছিল বটে প্রেমতোষবাবুর স্ত্রী নাকি অসুস্থ, কিন্তু অসুখটা যে ক্যানসার... ! আশ্চর্য, তার পরেও এ বাড়িতে আজ এই সভা...হট্টগোল... !

ভদ্রলোক বললেন, —অবাক হবেন না। এ বাড়িতে সাহিত্যসভা থাকলে পৃথিবী উল্টে গেলেও তা বন্ধ হবে না। দেখলেন না প্রেমতোষদার পুত্রবধূকে ? অণিমাদি ? একবার করে শাশুড়ির কাছে বসছেন, একবার নীচে এসে তদারক করে যাচ্ছেন ! উনিও কিন্তু খুব বড় সাহিত্যরসিক। নামী-দামি পত্রিকায় গল্প উপন্যাসের সমালোচনা করেন, মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজে চিঠিপত্র লেখেন...। একটা কলেজেও পড়ান। ইংরিজি। এ বছরই বোধহয় রিটায়ার করছেন।

অদিতির সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। এখানে উপস্থিত সব কটি মানুষকেই তার যেন কেমন ভিন্ন প্রজাতির মনে হচ্ছে। কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—আপনিও কি লেখালিখি করেন ?

—না না, আমি লিখি না। এখানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা বেশির ভাগই পাঠকমাত্র। সাহিত্যকে ভালবাসেন। আমিও তাই। তবে এখানে অনেক লেখকও আসেন। মাঝে মাঝে বড় বড় লেখকদেরও আমন্ত্রণ জানাই আমরা। কেউ আসেন, কেউ আসেন না। কবে থেকে এখানে এই সাহিত্যসভা চলছে জানেন ?

—হেমেনমামার কাছে শুনেছি। এটা নাকি খুব পুরনো...

—পুরনো নয়, প্রাচীন বলুন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হল। প্রতি দু মাসে একবার করে বসা হয়। আগে আগে কারা না এখানে এসেছেন ? প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী...। মাঝে বেশ কয়েকটা বছর প্রায় মরে এসেছিল, হেমেনদা কলকাতা ফিরে আবার আসরটাকে জমানোর চেষ্টা করছেন।

অদিতি চোখ ঘুরিয়ে একবার হেমেনমামাকে দেখে নিল। কী একটা পত্রিকা খুলে কোনও লেখা পড়ে শোনাচ্ছে দুই শিক্ষককে। আলগা হেসে অদিতি বলল,—হ্যাঁ, হেমেনমামার এ সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ।

—শুধু হেমেনদা নিজের লেখাটাই ধরে রাখতে পারল না এই যা। অথচ এককালে হেমেনদার তীর্থযাত্রী উপন্যাসটা কী পপুলারই না হয়েছিল। আমার লাইব্রেরিতে রেগুলার ইস্যু হত।

বইয়ের নামটা যেন মনে পড়ছিল অদিতির। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে আছেও বোধহয়। হেমেনমামা যে কেন এখনও লেখে না, এ প্রশ্ন অদিতির মনেও এসেছে, বারকয়েক হেমেনমামাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, সদুত্তর পায়নি। ঠাট্টার ছলে অন্য কথায় চলে যায় হেমেনমামা। নাহ, এ বার একদিন হেমেনমামাকে চেপে ধরতেই হবে।

প্রেমতোষ নেমেছেন। সঙ্গে অণিমা। দুজনের ঠোঁটেই আপ্যায়নের হাসি। অদিতি টান টান হয়ে বসল। কোনও বিষয়ে কতটা নিবেদিতপ্রাণ হলে পারিবারিক বিপর্যয়ের ওপরে এ রকম হাসির প্রলেপ দিয়ে রাখতে পারে মানুষ ? কেনই বা পারে ? ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম দেখার অভিলাষ নেই, সভাসমিতি করে নিজেদের প্রচার ছড়ানোও উদ্দেশ্য নয়, শুধু সাহিত্যকে ভালবেসে এ ভাবে এতগুলো মানুষ সংগোপনে এক জায়গায় জড়ো হয় ? সুপ্রতিম বা পাপাই তাতাই শুনলে নির্ঘাত বলত, উন্মাদ, উন্মাদ সব।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বাবু হয়ে বসেছেন প্রেমতোষ। সত্যিই তাঁর শরীর এখনও ঈর্ষণীয় রকমের মজবুত, দেখে সত্তর পঁচাত্তরের বেশি মনে হয় না। আলকাতরার মতো গায়ের রঙ, ধবধবে সাদা চুল, হাত গলার চামড়া শিথিল হলেও হাঁটাচলায় এক আশ্চর্য দৃপ্ত ভঙ্গি। তুলনায় অণিমাদির শরীর অনেক ভেঙেছে, প্রেমতোষকে তাঁর শ্বশুর বলে মনেই হয় না।

সভা যত ক্ষুদ্রই হোক, তার একজন সভাপতি থাকে। প্রেমতোষ সম্ভবত এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তবু হেমেন নিয়মমাফিক তাঁর নামটি প্রস্তাব করলেন, সমর্থনও করলেন একজন। অণিমা একটা খাতা খুলে সভার বিবরণী লিখছেন, সকলকে দিয়ে সইও করিয়ে নিলেন প্রথমে।

সভা শুরু হল।

আজকের সভায় গল্পপাঠের জন্য দুজনের নাম স্থির হয়ে আছে। অনল গুপ্ত আর অদিতি মজুমদার। অনল দুই তরুণের অন্যতম। সেই প্রথম স্বরচিত গল্প পড়ল। গল্পটি একটু জটিল ধরনের, অনলের পড়ার ভঙ্গিটিও

ভারী নিষ্প্রাণ। গল্পটি অদিতি ঠিক অনুধাবন করতে পারল না। গল্প শেষ হওয়ার পর একে একে আলোচনা করলেন সকলে। প্রায় তর্কের মতো বাগযুদ্ধ চলল খানিকক্ষণ। ভাল লাগা, মন্দ লাগা মিশিয়ে বেশ প্রশংসিতই হল লেখাটা।

এবার অদিতির পালা।

কাঁপা কাঁপা হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে গল্পটা বার করল অদিতি। হঠাৎই যেন অস্বাভাবিক দ্রুত লয়ে চলতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। তালু শুকিয়ে আসছে। জিভ খরখরে। জীবনে এই প্রথম তার সামনে একরাশ মনোযোগী শ্রোতা। যাদের এই মুহূর্তে অন্য কোনও কাজ নেই। যারা শুধু অদিতির গল্প শুনতে এসেছে।

এক নিশ্বাসে গল্পটা পড়ে ফেলল অদিতি। তার আশা পরেশ শেষ পর্যন্ত ছোট বাড়িটা থেকে আরেকটা বাড়িতে উঠে গেছে। এ বাড়ির ভাড়া অনেক বেশি, চব্বিশ ঘণ্টা জল, বাড়িটাও আগের থেকে বড়। তারা যে ফ্ল্যাটের জন্য জীবন পাত করছিল, তার চেয়েও বড়। গল্পের শেষে যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে কথাটা আশা বলছে পরেশকে। পরেশ নিশ্চুপ। মনে মনে বলছে, এখানেও কি আমাদের পুরোপুরি ধরে যাবে আশা? প্রাণপণে চাইলেও আমরা কি কোথাও সম্পূর্ণ ধরাতে পারি নিজেদের?...

এ গল্পটার আলোচনা তেমন জমল না। দু-তিনজন দায়সারা গোছের বললেন কিছু। একজন জানালেন, গল্পটি লেখিকার ফাটল গল্পের তুলনায় অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। বিশেষত পরেশের আর্তি যেন তেমনভাবে ফোটেনি। প্রেমতোষ আর অণিমার মতে গল্পটির ভাষা আগাগোড়া ঝরঝরে, কিন্তু লেখিকার আরও বেশি যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। হেমেন নীরব।

অদিতি বিষণ্ণ হয়ে গেল।

গল্পপাঠ শেষে চা বিস্কুট খাওয়া হল, টুকটাক কথাও হল খানিক, অদিতির মন বসছিল না কোনও কিছুতেই। এত কষ্ট করে, সংসারের উদ্বৃত্ত সময় কৃপণের মতো খরচ করে লেখা গল্প কত সহজে নস্যাৎ হয়ে গেল!

রাস্তায় বেরিয়েও কথা বলছিল না অদিতি। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, তা যেন একটুও লাগছে না গায়ে। কান এখনও লাল হয়ে আছে। অদিতি ঘামছিল।

হেমেন কথা শুরু করলেন,—কি, মন খারাপ হয়ে গেছে তো?

হালকা একটা শ্বাস ফেলল অদিতি, উত্তর দিল না। বাতাসে মিশে গেল নিশ্বাসটা।

হেমেন বললেন,—জীবনের প্রতিটা কাজে মানুষ একশো ভাগ সফল হতে পারে কি? চেষ্টা করাটাই হল আসল জিনিস। আমি জানি, তুমি চেষ্টা করেছ। ভুল বলছি?

নিঃশব্দে দু দিকে মাথা নাড়ল অদিতি। সে টের পাচ্ছিল তার ভেতর থেকে

একটা জেদ উঠে আসছে।

অদিতি ভাঙছিল। এক পুরনো অদিতিকে।

॥ আট ॥

এক দিকে এক পুরুষ্ট গোঁফ দশাসই তরুণ শাড়ি পরে ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে টুলের ওপর। অন্য দিকে ক্ষয়াটে চেহারার তালসিড়িঙ্গে যুবকের সর্বাঙ্গ মোটা বেডকভারে মোড়া। তার উদাস ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন কলকাতার চিড়চিড়ে রোদ্দুরে নয়, নরম শীতের সকালে দার্জিলিং-এর ম্যালে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের শোভা দেখছে সে। উল্টো প্রান্তে মধ্যবয়সী মানুষটি গামছা লেডিজ ব্যাগ ঝুলিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। পাশেই দু হাতে দু পাটি চটি গেঁথে ফটাফট বাজাচ্ছে এক তামাটে কিশোর। সেল সেল সেল সেল সেল। লিয়ে যান, লিয়ে যান, এমনটি আর পাবেন না। দুনিয়ার শেষ পিসখানা চলে গেল।

ভরদুপুরে গড়িয়াহাটে চৈত্রের মেলা কলমুখর।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঘমাক্ত যুবকটি পেশাদারী চিৎকার ছুড়ল, —ও বউদি যেয়েন না...ও বউদি শোনেন...

অদিতি বেশিদূর এগোতে পারেনি, বড় জোর চার-পাঁচ পা। বিজবিজে ভিড়ে এক কদম অগ্রসর হওয়াও এখন রীতিমতো সংগ্রাম। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। লোকারণ্য নয়, প্রমীলারণ্য। একে রবিবার, তায় কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিন মেলার মেয়াদ শেষ, তামাম কলকাতার কোনও রমণীই আজ বুঝি বাড়ি বসে নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এক বিশৃঙ্খল নারীবাহিনী যুদ্ধ শেষে উদ্দাম লুটপাটে নেমে পড়েছে। এই গুঁতোগুঁতির মাঝে হাঁটা কঠিন, স্থির থাকা বোধহয় আরও কঠিন।

অদিতি দাঁড়াতে পারছিল না। কোনওক্রমে গলা উঁচু করল, —কেন পিছু ডাকছ ? তুমি তো আমার দামে দেবে না।

—আহা শোনেনই না। এ দিকে আসেন, এ দিকে আসেন।

—শোনার কিছু নেই। আমি আর এক পয়সাও বাড়াব না।

—আর দশটা টাকা ?

—পারব না।

—পাঁচ ?

—এক টাকাও না। তোমার কাছে ছাড়া কি আর বেডশিট নেই ?

—আসেন, নিয়া যান। আর ঝঞ্ঝাট ভাল্লাগে না।

অদিতি মুখ টিপে হাসল। এই ভিড়েও লোকগুলোর সঙ্গে দরদাম চালাতে কেন যে তার এত মজা লাগে ! মুখগুলো ভারী টানে অদিতিকে। মাল বেচতে কেউ কেমন মরিয়া হয়ে ওঠে, কেউ বা নিরাসক্ত, কেউ সরস সংলাপে জমিয়ে দেয় পরিবেশ ! কেনা নয়, কেনার এই অনুষঙ্গগুলো অদিতির বেশি পছন্দ।

এই পিছু ডাকার ধরনটাও।

ফিরছে অদিতি। উজান স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছে। পাঁচ পা আসতে কালঘাম ছুটে গেল।

অদিতিকে বাগে পেয়েই হকার ছেলেটির প্রতিশ্রুতি টাল খেয়ে গেছে। ফুল ফুল বিছানার চাদরটি পাট করতে করতে বলল,—পাঁচটা টাকা আরও দেবেন বউদি।

—কেন ?

—দেখলেন না, পর পর দুদিন বাজার কেমন ঝাড় খেয়ে গেল ! ঝড় বৃষ্টি...পুরো লসে ঢুকে গেলাম।

অদিতি ছদ্ম কোপে তিনটে ভাঁজ ফেলল ভুরুতে, —অ্যাই, কাল তো সন্ধের পর ঝড় উঠল ! তোমাদের বাণিজ্য তো হয় সব দুপুরে !

—শেষ বাজারে দুপুর সন্ধে আর থাকে না বউদি। একটা সন্ধে লস মানে ম্যানহোলে ডুবে যাওয়া। প্লিজ বউদি, পাঁচ টাকা।

ছেলেটির কুশলী অনুনয়ে সত্যি সত্যি হেসে ফেলল অদিতি,—তুমি কিন্তু কথা ভাঙছ। এ রকম করলে কিন্তু নেব না।

সঙ্গে সঙ্গে এক হাত জিভ ঝুলে গেছে ছেলেটির। দু হাতে কানের লতি চিপল,—পাঁচটা টাকা চেয়ে নিচ্ছি বউদি। আপনি পুরাতন খরিদ্দার, আপনের থিকে কি বেশি নিতে প্যারি ? মনে করেন গরিব দেওররে ভালবেসে পাঁচটা টাকা দিলেন।

কথার প্যাঁচও জানে বটে ! পুরাতন খরিদ্দার ! দেওর বউদির ভালবাসা ! ঝানু গৃহিণীদের কীভাবে তুলতলে করে দিতে হয়, তা একেবারে ঠোঁটস্থ। কস্মিনকালে এর কাছ থেকে কিছু কিনেছে বলে অদিতির মনে পড়ে না। ওপার বাংলাকে এপার বাংলায় মিশিয়ে ভারী মিঠে এক ভাষাও বানিয়ে ফেলেছে ছেলেটা। আহা রে, সুপ্রতিমকে কখনও ফুটপাতের হকারদের কাছ থেকে কেনাকাটা করতে হয় না, করলে নিশ্চয়ই চমকিত হত।

দোকানবাজার থেকে কাগজের পাট প্রায় উঠেই গেছে, এসেছে এক পলিথিন যুগ। খাবার থেকে জুতো সবই এখন প্লাস্টিকের মোড়কে। ছেলেটি এক ফিনফিন প্লাস্টিকের থলিতে আঁটোসাঁটো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে বেডশিট, প্যাকেটখানা বিগ-শপারে সাবধানে গুছিয়ে নিল অদিতি। ছিঁচকে চোর ঘুরছেই, কে কখন প্যাকেট তুলে নেয়।

এখনও অদিতির উনকোটি রকমের সওদা বাকি। এই সেলের মরশুমেই বাপ ছেলেদের বচ্ছরকার ঘরোয়া পাজামা পাঞ্জাবি কেনা হয়। গেঞ্জি জাঙ্গিয়া আন্ডারওয়্যারও। নিজেদের শৌখিন প্যান্টজামা ছাড়া আর কিছু স্বহস্তে কেনা পোষায় না ছেলেদের। গরমে পাতলা পাতলা পাঞ্জাবি পরে সুপ্রতিম, তার জন্য বেছে বেছে গোটা কয়েক নিমা পাঞ্জারি কিনতে হবে। কাজের লোকরাও ফরমায়েশ জারি করে দিয়েছে। পয়লা বৈশাখে দুজনেরই ছাপা শাড়ি চাই।

পাতলা, কিন্তু জ্যালজেলে নয়। ওহো, পিলো কভারও তো কেনা দরকার। কয়েকটা কফিমগও। নিজের জন্যও কি একটা-দুটো ছাপা শাড়ি কিনবে ? সময় থাকলে দেখা যাবে।

এক দিনে এত বাজার করা কি মুখের কথা ? প্রতি বছর এই কেনাকাটাই অন্তত পাঁচ দিন ধরে করত অদিতি। দিনে একটা জিনিস, বড় জোর দুটো, হেঁটে দেখে চক্কর মেরেই দিব্যি কেটে যেত কয়েকটা দুপুর। তখন ছিল অনন্ত সময়, এখন দুপুর এলেই অসংখ্য চরিত্র মাথার ভেতর হুটোপুটি করতে থাকে। ভাষা দাও। ভাষা দাও। তবু সংসার বলে তো একটা কথা আছে। আর অদিতি না করলে এ সব করবেই বা কে ?

এক হৃষ্টপুষ্ট মহিলা জোর তর্ক জুড়েছে দোকানদারের সঙ্গে। কী নিয়ে বিবাদ বোঝা যাচ্ছে না, তবে মহিলার হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া করার ধরনটা ভারী মজার। এক হাত কোমরে, অন্য হাতের তর্জনী নাচছে দোকানদারের নাকের ওপর। তুমি ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো না ! তুমি আমাকে বাজে জিনিস নিতে বাধ্য করতে পারো না ! তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিতে পাবো না !

মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ভঙ্গিমা যেন চেনা চেনা !

হাজার বছরের ওপার থেকে সিগনাল ভেসে আসছে বিব বিব। ধরা পড়ছে মস্তিষ্কের রাডারে। অতলান্ত গহ্বর থেকে উঠে আসছে টাইম ক্যাপসুল। মুখটা খুলে গেল। স্কুলে কে যেন অবিকল এইভাবে ঝগড়া করত ?

অদিতি চেঁচিয়ে উঠল, —অ্যাই সুজাতা...

ডাক শুনেই ঘাড় ঘুরেছে মহিলার। অদিতির চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে অপলক। বিস্ময়। সংশয়। আবিষ্কার। সহসা রাগ মুছে মহিলার মুখমণ্ডল ভরে গেল নিষ্পাপ খুশিতে, —অদিতি না ?

অদিতি মাথা দোলালো।

মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে সুজাতা হাত চেপে ধরেছে অদিতির, —ইস্, কত দিইইন পর দেখা হল রে।

মস্তিষ্কের ক্যালেন্ডার ওল্টাচ্ছে অদিতি। অস্ফুটে বলল, —ছাব্বিশ বছর। না না, বোধহয় আঠাশ।

—তুই আমাকে দেখলি কী করে ?

—দেখতে পাইনি তো, শুনতে পেলাম। অদিতি হাসল। কিশোরীর চপল হাসি নয়, কুয়াশা মাখা হেমন্তের হাসি। সুজাতাকে আপাদমস্তক জরিপ করতে করতে বলল,—তোর চেহারাটা পাল্টেছে। মুটিয়েছিস, চশমা নিয়েছিস, কিন্তু গলাটা যাবে কোথায় ? আর ওই ঝামরে ঝামরে ঝগড়া করা ?

—আর বলিস না। বলেছিল শাড়িতে দাগ থাকলে পাল্টে দেবে, দ্যাখ না এখন...

—সেলের মাল বদল হয় না মাসিমা। সত্তর টাকার শাড়ি, সাত দিন পরে নিন। পিঙপিঙে দোকানদার এখনও টিটকিরি ছুড়ছে।

ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড ক্রূর চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল সুজাতা। সম্ভবত দৃষ্টি দিয়ে খুন করার চেষ্টা করছিল। না পেরে অলস ঔদার্যে বলল,—যাও যাও ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে কারও সঙ্গে এ রকম চিটিংবাজির চেষ্টা কোরো না।

অদিতি এক দৃষ্টে দেখছিল সুজাতাকে। স্কুলের সেই শ্যামলা ছিপছিপে লম্বাটে মুখ মেয়েটা এখন থপথপে গিন্নি। চুল কমে কপালে চড়া পড়েছে, জুলপির কাছে ঝুরো চুলে চিকচিক রুপোলি আভা, চশমার নীচে চোখের কোল ফোলা ফোলা, গলায় দু-তিনটে স্পষ্ট বৃত্তাকার ভাঁজ।

আঠাশ বছর সময় অদিতিকেও কি এতটা পাল্টে দিয়েছে। আয়নায় প্রতিনিয়ত যে মুখ দেখে অদিতি সে মুখের তো বড় একটা বদল হয় না। কিংবা হয়। নিঃসাড়ে। এই পরিবর্তন এত ধীর যে নিজের প্রতিবিম্বও তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারে না। অদিতির চোখে নিকটজন এবং নিকটজনের চোখে অদিতি দুটোই এমন নিত্যদিনের ছাঁচে ঢালা, যে সময়ের প্রবাহ এখানে প্রায় স্থবির। সর্বক্ষণই মনে হয় এই আমি তো সেই আমি। পনেরোয় যা ছিলাম পঁচিশেও তাই, পঁয়তাল্লিশেও। তিরিশ বছর দর্পণে নিজেকে না দেখে সহসা যদি কেউ আপন চেহারা বিম্বিত হতে দেখে, তবে কি সুজাতাকে দেখারই অনুভূতি হয়! কে জানে!

সুজাতা বুঝি অদিতির মনেব কথাটা ধরে ফেলেছে। চটাস করে অদিতির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, —তোর কিন্তু খুব একটা চেঞ্জ হয়নি। এএএকটু শুধু...রহস্যটা কী রে?

—কিছু রহস্য নেই। সংসার করছি, খাটাখাটুনি করছি, ছেলেদের পেছনে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে মোটা হওয়ার সময় পেলাম কই!

—ছোটাছুটি আমিই বা কী কম করি রে। একসঙ্গে অফিস সংসার ছেলেমেয়ে বড় করা, বরের মন জোগানো...

—ওমা, তুই চাকরি করছিস? কোথায়?

—রেলে। ফেয়ারলি প্লেসে। তুই?

অদিতি ফিক করে হাসল, —জেলে। হাজব্যান্ডস প্লেসে। আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত গৃহবধূ।

বয়স ভুলে দুই বন্ধু হেসে উঠল খিলখিল।

—তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে রে। ঘরে বসে থেকেও তুই মোটাসনি। আর আমি...

—মনে আছে স্কুলে মোটা মেয়ে দেখলে তুই হেসে গড়িয়ে পড়তিস? বি সেকশানের কাজল বলে একটা মেয়ে ছিল, তাকে তুই কুমড়োপটাশ বলে খেপাতিস?

—যাহ্, আমি অত মোটা হইনি। এই জানিস, সেই কাজল এখন কী রোগা হয়ে গেছে। গত বছর এক্সপোতে দেখা হল...কেমন শুকনো চেহারা, কণ্ঠা

বেরিয়ে গেছে...

—কাজলের বর মারা গেছে না ? স্ট্রোকে ?

—হ্যাঁ রে, কী স্যাড। দীপ্তিকে মনে আছে তোর...

চৈত্রমেলায় দুই বান্ধবী কথা বলে চলেছে কলকল। অতীতকে ছুঁয়ে নিচ্ছে, বর্তমানকে উগরে দিচ্ছে। তিন মিনিটে পরস্পরের ঠিকুজিকুষ্ঠি জানা শেষ। অদিতি কবে ফ্ল্যাট কিনল, সুজাতা কবে বাড়ি করেছে কসবায়, সুজাতার টাবলু ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কোন্ ইয়ার, মুনিয়া সামনের বার উচ্চমাধ্যমিক দেবে, সুপ্রতিম মাসে কত দিন ট্যুরে যায়, কদিন বাড়ি থাকে, সুজাতার বর ব্যাঙ্কের কোন্ শাখা থেকে কোন্ শাখায় বদলি হয়েছে, ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের পাণ্ডা বলে কত তার হাঁকডাক, পাপাই তাতাই কী কী ভালবাসে না, টাবলু মুনিয়া কী দেখলে নাক সিঁটকোয়, সব খবরই দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল। তবু যেন কথা ফুরোয় না। আরও কথা আছে। আরও কথা।

কালকের বৃষ্টি বেশ মুষলধারেই হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। রাস্তায় এখনও প্যাচপেচে কাদা। বৃষ্টির পর রোদ্দুরেরও আজ খুব মেজাজ। পশ্চিম আকাশে পৌঁছেও গলগল তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। গা হাত পায়ে জ্বালা ধরে যায়।

ছোট্ট রেস্টুরেন্টের আরও ছোট্ট ঘেরাটোপে মুখোমুখি বসেছে দুই বান্ধবী। মাঝখানে নুন গোলমরিচ। নুনের কৌটো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে অদিতি, গোলমরিচের কৌটোয় আঙুল বোলাচ্ছে সুজাতা।

—অ্যাই, মানসীর কোনও খবর জানিস্ ?

—নাহ্, বহুকাল দেখা হয় না। সেই যখন এন আর এস-এ ডাক্তারি পড়ছিল, তখন একবার শেয়ালদায় দেখা হয়েছিল। বোধহয় তখন ইন্‌টার্নি। স্বাগতা বলছিল মেডিকেলেরই কোন্ ব্যাচমেটকে বিয়ে করেছে।

—স্বাগতার সঙ্গে দেখা হয় ?

—মাঝে মধ্যে। ন মাসে ছ মাসে। বিশাল চাকরি করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। ওর লাকটা খুব ভাল। পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছিল, প্রোমোশান পেয়ে পেয়ে অনেক উঠে গেছে।

—লাক কেন বলছিস্ ? স্বাগতাই তো আমাদের মধ্যে লেখাপড়ায় সব থেকে ব্রিলিয়ান্ট ছিল। অঙ্কে কখনও নয়ের ঘরের নীচে পায়নি।

—তুই বা কী কম ছিলি রে ? বাংলা ইংরিজিতে স্বাগতা কোনওদিন তোকে ছুঁতে পেরেছে ? কী সুন্দর গল্প লিখতিস্, কবিতা লিখতিস্...

অদিতির বুকটা হঠাৎ টনটন করে উঠল। সে কবে কী পারত, আঠাশ বছর পরেও মনে করে রেখেছে বন্ধু, অথচ সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল কথাটাকে। ভুলে গিয়েছিল, না ভুলে ছিল ? পলকের জন্য অদিতির ইচ্ছে হল সুজাতাকে বলে ফেলে আবার সে শুরু করেছে গল্প লেখা, পর মুহূর্তে মত বদলালো। বাড়ির লোকেদের তরল ঔদাসীন্য তাও অত গায়ে লাগে না, কিন্তু চাকুরে সুজাতা যদি গৃহবধূ বান্ধবীর এই চেষ্টাকে 'ভালই তো মন্দ কী' গোছের বাহবা

দেয়, সেটা অদিতির সহ্য হবে না।

নিশ্বাস চেপে প্রসঙ্গ ঘোরাল অদিতি। হাসতে হাসতে বলল, —তুইও তো কী ভাল তর্ক করতিস্। আমরা বলতাম সুজাতা বড় হয়ে উকিল না হয়ে যাবে না।

—ওমা, জানিস না ? আমি তো উকিলই হয়েছিলাম ! সুজাতা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে,—ল পাশ করলাম, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করলাম। গলায় সাদা বো বেঁধে, ফুলহাতা ব্লাউজ পরে, কালো গাউন চাপিয়ে...

—চাকরি করছিস বললি যে ?

উচ্ছ্বাস মরে গিয়ে সুজাতা চকিতে মেঘলা বিকেলের মতো ম্লান। বেয়ারা দু প্লেট ফিশফ্রাই রেখে গেছে, কাঁটাচামচ দিয়ে আস্তরণটা খুঁটছে। প্লেটের দিকেই চোখ তার, তবু যেন নয়ন মেলে দিয়েছে বহু দূরে। বিড়বিড় করে বলল,—প্র্যাকটিস্টা ছেড়ে দিতে হল।

—কেন ? জমাতে পারলি না ?

—জমানো তো কঠিনই। তবু হচ্ছিল কিছু কিছু। আমার সিনিয়ার ছিলেন দীপেশ বাগ্চি, তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় ছিলাম বলতে পারিস্। নিজেও দু-একটা ইনডিভিজুয়াল কেস করছিলাম...।

—তো ?

—বিয়ের পর সব ভেস্তে গেল।

—কেন, তোর শ্বশুরবাড়ি কি খুব কন্জারভেটিভ্ ?

—এক কথায় বলা খুব কঠিন রে। তার আগে বুঝতে হবে কনজারভেটিভ্ কাকে বলে।

অদিতি হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সুজাতা মলিন হাসল,—বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। আমাদের বিয়েটা লাভ ম্যারেজ। বিকাশ তো ব্যাঙ্কে ঢোকার পর থেকেই ইউনিয়ন করে, মাঝে মাঝে আসত হাইকোর্টে। আমার সিনিয়ারের কাছে। তখনই আমাদের চার চোখে মিলন। হাইকোর্টের উকিল মেয়ে দেখে কেউ যে অমন পাগল হতে পারে, আমার বরকে না দেখলে তুই বিশ্বাসই করতে পারবি না। ঘন ঘন কোর্টে আসতে শুরু করল। ঘন ঘন কেন, রোজই। নিজেদের কেসের কথা আর কতটুকু থাকে, সারাক্ষণ আমি যে কোর্টে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মতো ড্যাশিপুশি স্মার্ট মেয়ে নাকি জীবনে দেখেনি ! আমায় কোথায় প্রোপোজ করেছিল জানিস ? চিফ জাস্টিসের কোর্টরুমে। ফাঁকা ঘরে একদম পেছনে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল এই আইনের মন্দিরে শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

—বাহ্, দারুণ রোম্যান্টিক ব্যাপার তো !

—হুঁ। শুনতে সেরকমই লাগে। এক কুচি শশা মুখে তুলে কচকচ চিবোচ্ছে সুজাতা,—তা বিয়েটা তো হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরও

আমাকে নিয়ে তখন কী আহ্লাদ। পাড়াপ্রতিবেশী সকলকে ডেকে ডেকে লইয়ার বউ দেখায় আমার শাশুড়ি। শ্বশুরমশাই বাড়িঅলাকে শাসায় ঘরে উকিল বউ এসে গেছে, আর আপনাদের ভয় পাই না। এদের কি গোঁড়া বলা যায় ?

—তা হলে ?

—তা হলে আর কিছু নেই অদিতি দেবী, পৃথিবীটা যে গোল সেই গোলই থেকে গেল। এক বছর যেতে না যেতেই শ্বশুরের মনে হতে লাগল সিনিয়ারের চেম্বার থেকে আমি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছি, শাশুড়ির মনে হতে লাগল বউ সংসারের কোনও কাজই তো করে না, ব্যস্ লেগে গেল' অশান্তি।

—আর বর ?

—বর মুখে কিছু বলত না। প্রগতিশীল মানুষ তো, পার্টি-ফার্টি করে...। তবে তার হাবভাবে আমি টের পেতাম। আরে ভাই, প্রেম করার জন্য ড্যাশিপুশি মেয়ে ঠিক আছে, ভীষণ অ্যাট্রাক্টিভ্। কিন্তু বিয়ে করলে সব পুরুষই বউকে একটু শাঁখা সিঁদুর নোলকে দেখতে ভালবাসে। নিজে বিছানায় শুয়ে ইউনিয়নের গল্প করতে পারে, বউ কোর্টকাছারির কথা বললেই মনে হবে পাশে একটা আইনের বই শুয়ে আছে। শ্বশুর শাশুড়ি বর যাকেই কোনও কথা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে যাই সেই ভাবে আইনের ধারা দেখাচ্ছি। ফেডআপ্ হয়ে প্র্যাকটিসের চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

—নিজেই ছাড়লি ?

—অগত্যা। ঘর সামলাতে গেলে সিনিয়ার কথা শোনায়, কাজে বেশি ইনভলভড় হলে ঘর। এর মধ্যে ছেলেটাও হয়ে গেল... পুরোপুরি ফেরে পড়ে গেলাম।

—চাকরিটা ধরলি কবে ?

—ছেলে হওয়ার পর। বরই বলল ঘরে চুপচাপ বসে থেকে কী করবে, একটা সাদামাটা সরকারি চাকরির চেষ্টা করো। বয়সটা ছিল, পরীক্ষায় বসলাম, জুটেও গেল। সব দিকে শান্তি। নো অ্যাম্বিশান। নাথিং।

—অত আফসোস করছিস কেন ? তাও তো তুই একটা চাকরি-বাকরি করছিস্, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশছিস। স্বাধীন জীবন...

—স্বাধীন জীবন না হাতি। চাকরি করা মেয়েদের পায়ে শিকলটা আরও শক্ত করে বাঁধা থাকে। সকাল থেকে কুকুরের মতো দৌড়ে মরো, রান্না দেখো, বর মেয়ের টিফিন গোছাও, তবু ভাগ্য ভাল ছেলে এখন হোস্টেলে থাকে, নইলে তারও ফরমাশ থাকত। তারপর নাকে-মুখে গুঁজে ভিড় বাসে যুদ্ধ করতে করতে অফিস দৌড়োও। সেখানেও আতঙ্ক, লাল দাগ পড়ে যাবে। তার পরও কত চিমটি কাটা কথা চালাচালি হয় অফিসে ! মেয়েরা কেন যে শুধু শুধু ছেলেদের ভাত মারতে অফিসে আসে ! অত যদি বাড়ির চিন্তা তো

বাড়ি বসে থাকলেই হয় ! কাজ করবে কী, চারটে বাজতে না বাজতে বাড়ি ফেরার জন্য সব ছোঁক ছোঁক করছে !

অদিতির ভুরু জড়ো হল,—তোরা মুখ বুজে শুনিস এ-সব ?

সুজাতা হেসে ফেলল,—সুখে আছিস রে ভাই, এক নৌকোয় পা দিয়ে আছিস্। ঘর বার দুটো এক সঙ্গে সামলানো হল গিয়ে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা। কন্‌টিনিউয়াস্ ব্যালান্স। সেই কোন্ যুগে চাকরিতে ঢুকেছিলাম, এখনও সার্কাসের খেলা দেখিয়ে যাচ্ছি।

চা এসে গেছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছল অদিতি। ঠিক বুঝতে পারছিল না কোন জীবনটা সুজাতা চেয়েছিল ? ঘরের, না বাইরের ? হাল্‌কাভাবে বলল,—এত কষ্ট করে এখন আর চাকরি করার দরকা‌র কী ? ছেড়ে দিলেই পারিস্ ?

—ওরে ব্বাস্, কী বললি রে ? সংসারে আমার মাইনেটাও তো লাগে। ওটা চলে গেলে আমার কর্তার বাজেট ফেল্ মেরে যাবে না ?

—তা হলে তোর বরেরও সংসারের দায়িত্ব কিছু নেওয়া উচিত। একা একা বাড়ির চিন্তা ভাবতে গেলে তোকে যে অফিসে কথা শুনতে হয়, এ কথাটাও তো তার চিন্তা করা দরকার।

—ভাবে বই কী। মনে মনে ভাবে। ইউনিয়ন মিটিং-এ লেকচার দেওয়ার সময় ভাবে। আর বাড়ি এসে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে শুয়ে পড়ে। কখন ফিরেছ ? এই এলে বুঝি ? গরম গরম এক কাপ চা খাওয়াও তো, বড্ড টায়ার্ড। ও, তুমিও টায়ার্ড ! তা হলে আর চায়ের ঝামেলায় যেয়ো না, কফি বানাও।

সুজাতার কথায় হাসতে হাসতে অদিতি বিষম খাওয়ার জোগাড়। বলল,—এ যে দেখছি আমার বরের কার্বনকপি রে।

—সে তো হবেই। বর তো দুনিয়ায় একটাই থাকে। মানে একটা ছাঁচ। হাতের মুদ্রায় শূন্যে একটা মানুষের অবয়ব ফুটিয়ে তুলল সুজাতা,—এই একটা বর থেকেই জেরক্স হয়ে হয়ে লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে বর বেরোতে থাকে। কেউ অদিতির বর হয়, কেউ সুজাতার, কেউ মানসীর, কেউ স্বাগতার। এ ভাই বিশ্বজনীন সিস্টেম। আমেরিকাতেও আছে, চিন জাপানেও আছে, ফ্রান্স জার্মানিতেও আছে।

—যাহ্, তুই আবার বাড়াচ্ছিস্। হাসতে হাসতে সখীকে চিমটি কাটল অদিতি,—আমাদের নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক তো দেখি তাঁর স্ত্রীকে খুব সাহায্য করেন। যেদিন কাজের লোক আসে না, বউয়ের কুটনো কুটে দেন, ঘর ঝাড়েন, এমন কি বাসন পর্যন্ত মাজেন।

—ওগুলো জেরক্সের ডিফেক্‌টিভ কপি। দেখিস্‌নি জেরক্সে কোনও কপি তেড়া বেঁকা হলে, কী কালি বেশি কম হলে সে কপিগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় ? তারাই হল ওই সব লক্ষ্মী বর। আমাদের অফিসেও আছে দু-এক পিস।

তাদের নিয়ে যা ঠাট্টাতামাশা চলে ! আমরা মেয়েরাও করি। বলি জরু কা গুলাম। সুজাতা চোখ টিপল,—বাঁদি দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে, গোলাম দেখলে চোখে লাগে। যাক গে যাক, এ-ভাবে তো যা হোক করে কাটিয়েই দিলাম জীবনটা। আর বিশ-পঁচিশটা বছর টেনে দিতে পারব না ?

হাসতে হাসতে কথা বলছে সুজাতা, তবু যেন হাসিতে কোথায় একটা চোরকাঁটা বিঁধে আছে। অদিতি বুঝতে পারছিল।

বাড়ি ফিরে মড়ার মতো শুয়ে রইল অদিতি। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এতকাল পর দেখা হয়ে মনটা কোথায় নীল আকাশ হয়ে যাওয়ার কথা, তার বদলে কোত্থেকে একরাশ বাদুলে মেঘ এসে জড়ো হচ্ছে মনে। উঠে কেনাকাটাগুলোও দেখাতে ইচ্ছে করছে না। সুপ্রতিম আর তাতাই ড্রয়িং স্পেসে। তাদেরও দেখার কোনও চাড় নেই। খবরের কাগজ খুলে দুজনের গজল্লা চলছে। ছেলেও আজকাল শেয়ার মার্কেটে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। বাজারের ওঠা নামা নিয়ে সপ্তাহভর গবেষণা চলে বাপ ছেলেতে। সপ্তাহ শেষে মিলোয় কার অনুমান সঠিক। তাতাই বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছে কিনা সেদিকে বাবার নজর নেই, কিন্তু অদিতির অপছন্দের এই নেশাটাকে দিব্যি ছেলের মধ্যে চারিয়ে দিচ্ছে।

খানিক পরে সুপ্রতিম ঘরে এল। বোধহয় দেশলাই-টেশলাই খুঁজতে। ঈষৎ গুমরোনো অদিতিকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল,—হল কী তোমার ? এসেই শুয়ে পড়েছ কেন ?

আড়াআড়িভাবে হাতে চোখ চাপা দিল অদিতি। চিত হল,—এমনিই।

—শরীর খারাপ লাগছে ?

—না।

—মাথা ধরেছে ? উফ্, যা রোদ্দুর ছিল আজ।

—তাতে তোমার কী এসে যায় ? তুমি তো আর ছাতা নিয়ে আমার সঙ্গে যাওনি !

—আমি গেলে প্রাণভরে চষতে পারতে ?

চষাই বটে। হাল চষা। তবে গরু লাঙল জমি তিনটেই অদিতি, এই যা। ভারী স্বরে অদিতি বলল,—ডাইনিং টেবিলে ফিশফ্রাই-এর প্যাকেট রাখা আছে, গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। যাওয়ার সময়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো।

—কী ব্যাপার বলো তো ? গল্পের প্লট-ফ্লট মাথায় ঘুরছে নাকি ? সুপ্রতিম হাসছে।

অদিতি বলতে পারত আমি কি সারা দিনই গল্প ভাঁজি ? তা হলে তোমাদের সংসারটা চালায় কে ? বলে কী লাভ, কে বোঝে !

বাইরে মেঘ জমছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ। নীল শিখায় আকাশের এক পাশ ফালা ফালা হয়ে গেল। ঝড় উঠছে বোধহয়।

॥ নয় ॥

পাপাই হাঁক দিল,—মা, তোমার ফোন।

অদিতি স্নানে ঢুকেছিল। কী তাপ, কী তাপ, বৈশাখ মাসটা এবার পুরো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল। সন্ধেবেলার দিকে এ সময়ে একবার গা মাথায় জল না ঢাললে শরীর কেমন অস্থির অস্থির করে।

শাওয়ার বন্ধ করে সাড়া দিল অদিতি,—কার ফোন ?

—শর্মিলা কাকিমার।

—কে ? অদিতি একটু অবাকই হল। হঠাৎ শর্মিলা তাকে ফোন করছে কেন ? শর্মিলা তো ইদানীং অদিতিদের কারও সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে না ?

পাপাই প্রশ্ন করল,—এক্ষুনি বেরোবে, না পরে করতে বলব ?

—ধরতে বল্। আসছি।

অদিতি গা মুছল না, ভেজা গায়েই শাড়ি ব্লাউজ চড়িয়ে নিল। যতক্ষণ গায়ে জলটা থাকে ততক্ষণই আরাম।

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে রিসিভার তুলল অদিতি,—কীরে, তুই হঠাৎ ?

—তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল। শর্মিলার গলা ভার ভার।

—আমার সঙ্গে ? বল্।

—ফোনে বলা যাবে না। তুই আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারবি ?

—এখানে চলে আয় না।

—তোর ওখানে ? শর্মিলা যেন থমকাল,—কথাটা একটু কন্‌ফিডেনশিয়াল। তোকেই বলতে চাই। কখন তোকে একা পাওয়া যাবে ?

—দুপুরের দিকে একা থাকি।

—দুপুর ? শর্মিলা আবার কী যেন ভাবছে,—ঠিক আছে। কাল থাকবি ?

—থাকব। অদিতি সামান্য কৌতূহলী হল,—তোর ছেলের খবর কী ?

—ভাল আছে।

অদিতি আরেকটু টোকা দিল,—তুই কি বাপের বাড়ি থেকে ফোন করছিস ?

—না। পাবলিক বুথ থেকে। শর্মিলা আবার থেমে থেকে বলল,—আমি যে যাব সেটা কিন্তু কাউকে বলিস্ না। আই মিন্ সুপ্রতিমদাকে। প্লিজ।

টেলিফোন রেখে একটুক্ষণ ভাবল অদিতি। শর্মিলার ব্যক্তিগত সমস্যায় অদিতির কী করার আছে ? অদিতি যত দূর শুনেছে দীপকদার সঙ্গে শর্মিলার ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা কোর্টে চলে গেছে। সুপ্রতিমকেই বা বলতে বারণ করল কেন ? সুপ্রতিম কি শর্মিলার সঙ্গে কিছু... ? ধ্যাৎ, তা কি করে হয় ? তেইশ বছর ঘর করে হাতের তালুর মতো চেনা মানুষটাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবল অদিতি ? ছিঃ। দীপক-শর্মিলার সঙ্গে হাজার একটা পার্টি পিকনিকে গেছে অদিতি, বছর আষ্টেক আগে একবার এক সঙ্গে দেরাদুন মুসৌরি বেড়াতে গিয়েছিল, কোনওদিন তো শর্মিলা সম্পর্কে সুপ্রতিমের তিলমাত্র অশোভন

আগ্রহ দেখেনি ! বরং বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে সুপ্রতিম একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলে। পিছনে লাগে, ফাজলামি ইয়ার্কি করে, তবে সবেতেই খুব সচেতন, মাপা। এ ব্যাপারে বউমহলে সুপ্রতিমের বেশ সুনাম আছে। শর্মিলা কি তবে দীপকদার সঙ্গে মিটমাট করতে চায় ? অদিতিকে মিডিয়াম করবে ? সেটাই বা সুপ্রতিমকে গোপন করতে হবে কেন ? লজ্জা ? আর কী হতে পারে ?

কাল্পনিক ভাবনায় চাঁদি গরম করা পোষাল না অদিতির। তার হাতে এখন অনেক কাজ। পাপাইয়ের পরীক্ষা চলছে, এ সময়ে ছেলের কিছু কিছু বাতিক সামলাতে হয় অদিতিকে। সারা দিন ধরেই। দুপুরে রাতে কখনই পাপাই এখন পেট পুরে খাবে না, তাতে নাকি ঘুম পেয়ে যায়। আবার খালিও রাখা চলবে না পেট, খিদে পেলে পাপাইয়ের মনঃসংযোগে অসুবিধা হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এখন খাওয়ার আয়োজন। সন্ধেবেলা একবার মিল্কশেক খাবে, আটটা নাগাদ আম। সেই আম আবার কেটে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে হবে এখনই, যথেষ্ট ঠাণ্ডা না হলে আমে নাকি স্বাদ আসে না। এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বন্ধুরা আসছে অথবা হঠাৎ হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে বন্ধুদের বাড়ি ছুটছে পাপাই, তাড়া তাড়া নোটস্ ধরিয়ে দিচ্ছে অদিতিকে। মা, প্লিজ চটপট জেরক্স করে এনে দাও না। নিজের লেখাই এখন শিকেয় তোলা, অন্যের ভাবনা নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসবে অদিতি ! আর সুপ্রতিমকে এক রাত কথাটা না বললে অদিতির কি পেট ফেটে যাবে। কাল দুপুর অবধি দেখাই যাক।

পরদিন দুপুরে ফুটিফাটা বোদ মাথায় করে এল শর্মিলা। পাপাইয়ের আজ থিয়োরিটিকাল পরীক্ষার শেষ দিন, কাজের লোকরাও বাড়িতে নেই, ফ্ল্যাট আক্ষরিক অর্থেই শুনশান। শর্মিলা তবু অস্বস্তি ভরা চোখে দেখছে চারদিক। প্রচণ্ড উত্তাপে মুখ থমথমে লাল। দরদর ঘামছে। ভূমিকা না করেই আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিল। সুপ্রতিম নাকি দীপককে নিয়ে শর্মিলার বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শর্মিলার অনুপস্থিতিতে শর্মিলার বাবা মাকে ভয় দেখিয়ে এসেছে। শর্মিলা যদি ছেলের হেপাজতের দাবি ছেড়ে না দেয় তা হলে কোর্টে শর্মিলাকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে দীপক। শুধু এটুকুই নয়, টিনটিনের স্কুলেও নাকি বার দুয়েক হানা মেরেছে দীপক আর সুপ্রতিম। স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে শর্মিলার নামে প্রচুর কুৎসা রটনা করেছে, একদিন নাকি টিনটিনকে জোর করে স্কুল থেকে তুলে আনতে চেয়েছিল। দীপক অতি হীন চরিত্রের মানুষ, সে যে এরকম কিছু করবে সেটা নাকি আন্দাজ করেই আগাম থানায় খবর দিয়ে রেখেছে শর্মিলা। তার অভিযোগ, এর মধ্যে সুপ্রতিম কেন ?

সবটুকু শুনে অদিতি নিথর বসে রইল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য, সুপ্রতিম তাকে কিছুই বলেনি ! সুপ্রতিমের মতো মানুষ এই ধরনের ছেলেমানুষি কাণ্ড করেছে ! তাও এই বয়সে, যখন প্রায় বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় ! এই মধ্যবয়সে সুপ্রতিমকে প্রায় এক ভাড়াটে গুণ্ডার অপবাদ দিচ্ছে একটা বাইরের মেয়ে, অদিতিকে বসে

হজম করতে হচ্ছে ! ছিঃ ।

অদিতি শুকনো গলায় বলল,—আমাকে এ-সব না বলে তুই ডাইরেক্ট সুপ্রতিমের সঙ্গে কথা বলছিস্ না কেন ?

শর্মিলা সোফায় হেলান দিয়েছে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। দু দিকে মাথা নেড়ে বলল,—ভরসা হয়নি। দীপকের সঙ্গে সুপ্রতিমদার এত ভাব...। ভাবলাম তোকে আগে বলি। তুই তো মেয়ে, তুই নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটা ফিল করতে পারবি।

অদিতি শর্মিলার কাঁধে হাত রাখল,—তুই একটু বোস্। ...অফিস যাস্‌নি আজ ?

—না। বাড়ি থেকেই আসছি।

—হাঁপাচ্ছিস খুব। দাঁড়া একটু শরবত করে আনি।

দু-এক চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল শর্মিলা, সেন্টার টেবিলে দৃষ্টি স্থির। অস্ফুটে বলল,—তোর শুনতে খুব খারাপ লাগল, তাই না রে ?

খারাপ লাগা ! অভিমান ! ক্রোধ ! অপমানবোধ ! ঠিক কী অনুভূতি যে হচ্ছে অদিতি নিজেই জানে না। প্রাণপণে গলা স্বাভাবিক রেখে বলল,—আমার বর কতটা ইনভলভড্ আমি জানি না। তবে যদি কিছু করে থাকে ঠিক কাজ করেনি। কিন্তু তুই আমাকে একটা কথা বল তো ? দীপকদাই বা তোর ওপর এত হিংস্র হয়ে উঠল কেন ? তাও বিয়ের বিশ বছর পর ?

—স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক কেমন তা কি বাইরে থেকে বোঝা যায় রে ? বিশেষ করে আমাদের মতন ভদ্র বাড়িতে ? শর্মিলা নিজের নিশ্বাসে নিজে কেঁপে উঠল,—ও আজ থেকে তো এরকম নয়, বরাবরই...

—তা হলে তুই আগেই ডিভোর্স করিসনি কেন ?

—আমরা মেয়েরা কি চট করে সংসার ভাঙতে পারি ? না ভাঙতে চাই ? সব সময়ে ভাবি ফাঁকফোঁকরগুলো রিপু করে করে চালিয়ে নেব। বিয়ের পর বাচ্চা হতে দেরি হচ্ছিল, তখন কী যাচ্ছেতাই না করেছে। তুমি ইচ্ছে করে বাচ্চা চাও না ! তোমার খুব রূপের অহঙ্কার ! জানিস্, একদিন আমাকে গেলাস ছুড়ে মেরেছিল, একটুর জন্য চোখ বেঁচে গেছে। এক একবার তুলকালাম করে তারপরেই এমন কান্নাকাটি শুরু করে দিত...। বিয়ের আট বছর পর যখন টিনটিন পেটে এল ভাবলাম এবার অন্তত ঠাণ্ডা হবে। তখন শুরু হল সন্দেহ। ও বাচ্চা আমার নয় !

—কেন, এরকম সন্দেহ এল কেন ?

—সন্দেহের কি কারণ লাগে রে ?

—এমনি এমনি সন্দেহ এল ! অদিতি ঈষৎ কটাক্ষ করল,—নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছিল যাতে দীপকদার বিশ্বাস ভেঙে গেছিল ?

শর্মিলা আহত হল না। তার সুন্দর ডিম্বাকৃতি মুখে লালচে আভা ফুটেও মিলিয়ে গেল। হাসল, বড় শীর্ণ হাসি। শান্তভাবে বলল,—দেখ্ অদিতি,

বিশ্বাস, বিশ্বাস ভাঙা, সন্দেহ এ-সব বড় আজব শব্দ। সবই মানুষের মনগড়া, কিন্তু রকমফের আছে। মানুষ গাছপালা পশুপাখি জীবজন্তু এদের মতো বিশ্বাসেরও একটা শরীর থাকে। আমাদেরই তৈরি করা, তবু আছে। তার লয়-ক্ষয় আছে, ভাঙনও আছে, মৃত্যুও আছে। কিন্তু সন্দেহ হল অশরীরী। ধোঁয়ার মতো। কুয়াশার মতো। এ এমন ধোঁয়া যা চোখে দেখা যায় না, অথচ চোখের মণিতে লেগে থাকে। ওই ধোঁয়াচোখে তাকালে সব কিছু আবছা। একে মারা যায় না, কাটা যায় না, উপড়োনো যায় না। বুঝতে পারছিস কী বলতে চাইছি? সন্দেহের জন্য কোনও উপকরণ লাগে না রে। আমাদেরই দুর্বলতার ছিদ্র দিয়ে সন্দেহ মনের ভেতর ঢুকে পড়ে। চারপাশের জগৎ থেকে উপকরণ খুঁজে নিয়ে আমরা সেটাকে মেলাতে চাই। একটা না মিললে আরেকটা উপকরণ খুঁজি, সেটা না মিললে আরেকটা। দীপক তো আমাকে বিশ্বাসই করেনি, বিশ্বাস ভাঙার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? তার তো আগাগোড়াই সন্দেহ। বাচ্চা হচ্ছে না কেন তাই নিয়ে সন্দেহ, বাচ্চা হচ্ছে কেন তাই নিয়ে সন্দেহ। আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলে সন্দেহ, দেরিতে ফিরলে সন্দেহ। ভাবতে পারিস, আমার এখন বয়স হয়ে গেছে, একটা বারো বছরের ছেলের মা, আমাকে একটা বাচ্চা আঠাশ তিরিশ বছরের ছেলের সঙ্গে সন্দেহ করে? ছেলেটার দিদি মরে গেছে, আমাকে দিদি দিদি করে...। অথচ দেখ, ধীরাদিকে জড়িয়ে অনেকে তো ওর সম্পর্কে অনেক কথা বলে। আমি কান দিইনি, এখনও দিই না। কেন দেব বল? আমার স্থির বিশ্বাস, দীপক পৃথিবীতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারে না। ওই মানুষ করবে অ্যাফেয়ার? তা হলে আমার ধীরাদির ওপর করুণা হবে।

শান্ত মুখে শুরু করেও উত্তেজিত হয়ে গেছে শর্মিলা। টেবিল থেকে গ্লাস তুলে এক ঢোঁকে পুরো শরবতটা খেয়ে নিল। শরীর ছেড়ে দিয়েছে সোফায়। চোখ বুজেছে।

অদিতি কুণ্ঠিত মুখে বলল,—সব বুঝলাম। তবু বলি, টিনটিনকে নিয়ে টানাটানিটা কি না করলেই নয়?

—না, দীপকের শাস্তি পাওয়া দরকার। শর্মিলা হঠাৎ ফুঁসে উঠেছে,—এখন ছেলে ছেলে করে কাঁদছে, অথচ একদিন এই ছেলেকেই দীপক...। আসলে কী জানিস, টিনটিনকে কেড়ে নিয়ে ও আমাকে জব্দ করতে চাইছে। আমি প্রাণ থাকতে টিনটিনকে ছাড়ব না। আমার এগেনস্টে ও যদি পাঁচটা অ্যালিগেশান আনে, আমি ওর এগেনস্টে পঞ্চাশটা অ্যালিগেশান আনব। অনেক ইনসাল্ট সহ্য করেছি, আর নয়। যখন কম বয়স ছিল তখন অনেক সোস্যাল বেরিয়ার ছিল, আমি এখন আর কিছুকে ভয় পাই না।

অদিতি শর্মিলাকে দেখছিল। কুড়ি বছর এক সঙ্গে ঘর করার পরও পারস্পরিক সম্পর্কে এত বিতৃষ্ণা জমতে পারে? তা হলে সম্পর্ক কথাটার অর্থ কী? শিকড়বিহীন হয়ে শুধু ডালপালা ফুলপাতা মেলে দাঁড়িয়ে থাকা? অথবা

দড়ির ওপর হাঁটা ? ব্যালান্স্ করতে করতে ? সার্কাসের খেলার মতন ?

রাত্রে শোওয়ার আগে কথাটা তুলল অদিতি। সরাসরি নয়, একটু বাঁকা পথে। নিরীহ মুখে সুপ্রতিমকে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁ গো, দীপকদার সেই কেসটার কী হল ?

স্নান সেরে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সুপ্রতিম। বলল,—মামলা চলছে।

—কে শেষ পর্যন্ত করল মামলা ? দীপকদা, না শর্মিলা ?

—শর্মিলা। তবে দীপকও ছাড়নেঅলা নয়, লড়ে যাবে।

—কী নিয়ে লড়বে ? ডিভোর্স নিয়ে ? দীপকদা কি ডিভোর্স দিতে চায় না ?

—দীপক টিনটিনকে দিতে চায় না। ছেলের কাস্টডি নিয়ে মনে হয় জোর টানাটানি চলবে।

গরমকালে রাত্রে এ বাড়িতে মশারি টাঙানোর চল নেই, রাসায়নিক ট্যাবলেট রক্তচক্ষু মেলে সারা রাত মশা তাড়ায়। নতুন একটা ট্যাবলেট যন্ত্রে গুঁজে দিল অদিতি। সুইচ অন করে বলল,—শর্মিলারই কিন্তু কাস্টডি পাওয়া উচিত।

—কেন ?

—কারণ ও টিনটিনের মা। ছেলেরা মায়ের কাছে থাকাই বেশি প্রেফার করে।

সুপ্রতিম আলোর দিকে চিরুনি তুলে চুল খুঁজছে। বলল,—দেখো কে পায়।

—দীপকদা যে জেদ করছে, ছেলে নিয়ে সামলাবে কী করে ? সন্ধেবেলা বোতল খুলে বসবে, ছেলের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

—ছাড়ো তো। যার ছেলে সে বুঝবে। আমাদের মাথা ঘামানোর কী দরকার ? চালশে চশমা চোখে পরছে সুপ্রতিম,—পাপাইয়ের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা কবে ?

—সোমবার ডেট দেবে। অদিতি আয়নার ভেতর দিয়ে সুপ্রতিমকে দেখছিল। চোখ না সরিয়ে বলল,—দীপকদাদের ব্যাপারে আমাদের কোনও মাথা ঘামানোর দরকার নেই বলছ ? তোমার এতদিনের বন্ধু...

—কী আর করা যাবে। সম্পর্ক যদি না টেকে... বেটার পার্ট অ্যাজ্ ফ্রেন্ডস্ দ্যান লিভ টুগেদার অ্যাজ এনিমিজ।

—ওরা এখন দূরে থাকলে শত্রু, কাছে গেলেও শত্রু।

—হুঁ। ইদানীং ওদের রিলেশানটা বড় তিক্ত হয়ে পড়েছিল। সুপ্রতিম হঠাৎ যেন একটু সচকিত হল,—তোমার হঠাৎ দীপকদের ব্যাপারে এত উৎসাহ কেন ?

ইঁদুরবেড়াল খেলাটা আর পছন্দ হচ্ছিল না অদিতির। খর গলায় বলে উঠল,—তোমার উৎসাহ নেই ?

—আমার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার। ন্যাকামি করছ কেন ? শর্মিলা আজ দুপুরে এখানে এসেছিল। ঘরে বসে মুনিঋষির মতো কথা বলছ, এদিকে সাত জায়গায় শর্মিলার কুচ্ছো গেয়ে বেড়াচ্ছ, তোমার লজ্জা করে না ? ছি ছি, শর্মিলা কী অপমানটাই না করে গেল আজ !

হঠাৎ মিথ্যা ধরা পড়ে গেলে অসহায় অবস্থাতেও একটা রাগ আসে। মরিয়া, কিন্তু অক্ষম রাগ। সিগারেট ধরিয়ে ফসফস টানল সুপ্রতিম, ঘষে ঘষে অ্যাশট্রেতে নেবাল,—শর্মিলা এসেছিল তুমি এতক্ষণ বলোনি কেন ?

—তুমিও তো বলোনি। তুমি শর্মিলার বাড়িতে গিয়েছিলে, টিনটিনের স্কুলে গিয়েছিলে... একটা পঞ্চাশ বছরের লোক, খোকামি করে বেড়াচ্ছ...

—বাজে কথা বোলো না। শর্মিলা যা বলে গেছে সবই বুঝি ধ্রুব সত্যি ?

—সত্যিটা কী তুমিই বলো না। পেটে চেপে রেখেছ কেন ? আমি তো সত্যিটাই জানতে চাই।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বেড়ালের মতো খুনি চোখে তাকাচ্ছে সুপ্রতিম। নিশ্বাস ফেলছে জোর জোর। ঢকঢক করে গোটা জগের জল শেষ করল। বেডসুইচ টানল খাটের বাজুতে। পড়াত করে আলো নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে হিস হিস করে উঠেছে,—যা করেছি, ঠিক করেছি। যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। তোমার কাছে আমায় কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

ফটাস্ করে আলো জ্বালিয়ে দিল অদিতি,—ঘর অন্ধকার করছ কেন ? মুখ দেখাতে লজ্জা করছে ?

স্থান কাল ভুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সুপ্রতিম,—আমাকে ঘুমোতে দেবে ? গাধার খাটুনি খেটে আমায় তোমাদের অন্ন জোগাতে হয়। রাত দুপুরে ইয়ে করা আমার ভাল্লাগে না।

অদিতি ঝুম হয়ে গেল। ঝুম, না নিঝুম ?

পরদিন থেকে সুপ্রতিমও গুম। এক বিরক্ত বুলডগের মুখোশ এঁটে ঘোরাফেরা করছে বাড়িতে। সকালবেলা বেরিয়ে যায়, রাত করে ফেরে। ছুটির দিনেও আয়েশ আরাম ফেলে টো-টো করতে চলে যায় কোথায়। ছেলেদের সঙ্গে যেচে কথা বলে না, বড় জোর চোয়াল ফাঁক করল, ব্যস্। পাপাই তাতাই বাবার এই মেজাজটা দেখেছে কয়েক বার, তারাও বাবাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। অদিতিকেই পুছতাছ করেছে তারা। বাবা হঠাৎ আউট অফ ফোকাস্ কেন ? এবার কী নিয়ে ফাইট্টা হল তোমাদের ? অদিতি বিরস মুখে এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা। বলবেই বা কী ছেলেদের ?

সুপ্রতিমের সঙ্গে ঝগড়া হলে সাধারণত অদিতিই মিটিয়ে নেয়। বাড়ির ভেতর একটা হুতুম প্যাঁচা ঘুরে বেড়াবে, এটা কি খুব দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য ? তরল মেজাজের মানুষ হলেও সুপ্রতিমের মধ্যে একটা গোঁয়ার্তুমিও আছে। এ ধরনের লোকদের বাবা বাছা করে ঠাণ্ডা করতে হয়।

এবার অদিতি তা করল না। তারও বুকের হাড়পাঁজরায় এক তপ্ত বাতাস

জমাট বেঁধে আছে। হয়তো সুপ্রতিম নিছক বন্ধুকে সঙ্গ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শর্মিলার বাড়ি গিয়েছিল। বা টিনটিনের স্কুলে। দীপকদা তেমন বাক্‌পটু নয়, সুপ্রতিমকে হয়তো জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল দীপকদা। বন্ধুর জন্য সুপ্রতিম এ কাজ করতেই পারে। অন্যায় জেনেও। কিন্তু অদিতিকে গোপন করল কেন ? সব থেকে বেশি অদিতির বুকে বেজেছে সেই রাতে সুপ্রতিমের নির্বিকার হাবভাবটা। সুপ্রতিমকে ওই স্তরের মিথ্যাচারী ভাবতে কী যে কষ্ট হচ্ছে অদিতির !

এরই মধ্যে হেমেন এলেন একদিন। সঙ্গে একটি বছর তিরিশেকের ছেলে। হেমেনের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই এক-আধটা চেলাচামুণ্ডা আসে আজকাল। এই ছেলেটি নতুন। ছিপছিপে চেহারা, রোদে পোড়া ফর্সা রঙ, গালে সযত্নে লালিত এলোমেলো দাড়ি। চোখ দুটিও সুন্দর। ভাসা ভাসা। মায়া মাখানো। সাদা চোস্তের ওপর নরম হল্‌দে পাঞ্জাবি পরেছে ছেলেটি, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ।

প্রথম দর্শনেই ছেলেটিকে বেশ ভাল লেগে গেল অদিতির।

খুন্তি হাতেই ছুটে এসেছিল অদিতি, হেমেন সোফায় বাবু হয়ে বসে বললেন, —দেখো রঞ্জন, এই সেই অদিতি মজুমদার। এক হাতে খুন্তি চালায়, অন্য হাতে কলম।

অদিতি লাজুক হাসল, —যাহ্, আপনার না বাড়াবাড়ি। না ভাই, গল্প আমি সাকুল্যে গোটা চারেক লিখেছি। আর খুন্তি চালানো ? আজ রান্নার লোক ছুটি নিয়েছে তাই বাধ্য হয়ে...

রঞ্জন বিনীতভাবে বলল, —আপনার ফাটল গল্পটা আমার অসাধারণ লেগেছিল।

রঞ্জনের কণ্ঠস্বরটিও ভারী উদাত্ত। পুরনো হেমেনমামাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবৃত্তি করে নাকি !

রঞ্জন আবার বলল,—তার পরেও আপনার কী একটা গল্প পড়লাম ? কী যেন নাম ?

অদিতি হেসে ফেলল, —নাম মনে নেই তো ? তার মানে ভাল লাগেনি।

—না না, ওই গল্পটাও ভাল। তবে এক একটা গল্প মনকে সরাসরি বিদ্ধ করে। ফাটল গল্পটা সেরকম। মনে হয় কোথায় যেন একাত্ম বোধ করতে পারছি। জানেন আমার এক কাকা গল্পটা পড়ে ভীষণ মন খারাপ করে বসে ছিল।

ক'দিন ধরে বুক কামড়ে পড়ে থাকা দমচাপা ভাবটা ক্রমশ লঘু হয়ে আসছে। অদিতি হাসি মুখে বলল, —এত প্রশংসা করলে তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কী খাওয়াব বলুন, ঠাণ্ডা না গরম ?

—গরম। চা। হেমেনই উত্তর দিলেন, —তোমার বড় পুত্রের পরীক্ষা শেষ হল ?

—হ্যাঁহ্‌। নিশ্চিন্ত। গত কাল প্র্যাক্‌টিকাল হয়ে গেল।

—কী পরীক্ষা দিল আপনার ছেলে?

—পার্ট টু। বি. এস্‌সি।

রঞ্জন বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়েছে, —আপনার এত বড় ছেলে আছে! দেখে কিন্তু একদম মনে হয় না।

অদিতি ভ্রূকুটি হাসল, —একটা নয়, আমার দুটো ছেলে আছে। ছোট জন সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে।

—বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখে পঁয়ত্রিশের বেশি মনেই হয় না।

হেমেন গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, —এরকম একটা কমপ্লিমেন্ট পেলে, ওর চায়ে একটু বেশি করে চিনি দিয়ো।

অদিতি দ্রুত রান্নাঘরের কাজ শেষ করে চা নিয়ে এসে বসেছে। বড় প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে নোন্‌তা বিস্কুট, চানাচুর, হিমশীতল সন্দেশ।

চা খেতে খেতে হেমেন বললেন, —রঞ্জনও কিন্তু খুব ভাল লিখছে এখন। দেশ পত্রিকায় ওর দুটো গল্প বেরিয়েছে।

অদিতির ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, —আপনিই রঞ্জন দাশগুপ্ত?

লজ্জা লজ্জা মুখে মাথা চুলকোল রঞ্জন, —বাবা মা ওই নামটাই রেখেছেন।

—দুটো গল্পই আমি পড়েছি। স্বপ্নের নৌকো. আর অন্ধ দৌড়। ঠিক বলছি?

রঞ্জন ঘাড় নাড়ল।

অদিতি বলল, —আপনি থাকেন কোথায়? এদিকেই?

—না, একদম উল্টো দিকে। বারাসত।

হেমেন বললেন, —বারাসতে ওদের একটা গ্রুপ আছে। তরুণ লেখকদের। নিয়মিত বসে সকলে, গল্প পড়া হয়, আলোচনা হয়...। ওদের গ্রুপের আরেক জনও খুব উঠছে। আনিসুর রহমান। আনিসুরের লেখা তুমি পড়েছ অদিতি?

—নামটা শোনা শোনা। মনে হচ্ছে পড়েছি।

হেমেন বললেন, —এই রঞ্জন, আনিসুরকে একদিন এনো না এ বাড়িতে। তুমি তো চিনে গেলে।

—সে আনাই যায়। রঞ্জন অদিতিকে বলল, —আপনিও একদিন আমাদের ওখানে চলুন না।

—যাহ্‌, আমি কি তরুণ নাকি? জানেন এই নভেম্বরে আমি ছেচল্লিশে পড়ব?

হেমেন হাসছেন,— তারপর ক' বছর তোমার ছেচল্লিশ চলবে?

—কেন?

—বারে, মেয়েদের তো শুনেছি তিরিশের পর থেকে দু-তিন বছর পর পর

একটা করে জন্মদিন হয় !

—হেমেনমামা, আপনি না... । অদিতি হেসে বাঁচে না, —দু দুটো ছেলে তালগাছের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, কোন ফাঁক দিয়ে বয়স লুকোব ?

রঞ্জন বলল, —তাতে কিছু এসে যায় না । আপনি যখন নতুন লিখছেন, তখন আপনি তরুণই । সে আপনার আশি বছর বয়স হলেও আপনি তরুণ । কি হেমেনদা, ঠিক কিনা ?

গল্পগুজবে হাসিঠাট্টায় অন্তর ধুয়ে যাচ্ছিল অদিতির । প্রথম জ্যৈষ্ঠের উষ্ণতাও আর তত প্রখর লাগছে না । খোলা জানলা দিয়ে লাজুক লাজুক বাতাস আসছে মাঝে মাঝে । স্বপ্নের কুঠুরিটা খুলে যাচ্ছে অদিতির । লেখালিখির গল্প, গল্পের গল্প রূপকথা হয়ে অদিতিকে নিয়ে চলেছে কৈশোরের দরজায় । অথবা এক প্রমত্ত যৌবনে ।

হেমেন সোফায় পা নাচাচ্ছেন, —তারপর ? তুমি কিছু লিখলে ? অনেক দিন কিন্তু তোমার গল্প শোনা হয়নি ।

অদিতি টিপ-টিপ হাসল, —পাপাইয়ের পরীক্ষার আগে একটা লিখেছিলাম । ফেয়ার করা হয়নি । পরে পড়ে শোনাব ।

—পরে কেন ? আজই নয় কেন ? রঞ্জন নড়েচড়ে বসেছে ।

অদিতি বলল, —না বাবা, আপনারা সব বড় বড় লেখক, আপনাদের সামনে আমি গল্প পড়ব না ।

—এরকম বললে তো আজই শুনতে হয় ।

হেমেন বললেন, —নিয়ে এসো না । চটপট শুনিয়ে দাও । রঞ্জন আবার বারাসত ফিরবে ।

—গল্পটা কিছু হয়নি হেমেনমামা । আরেকবার লিখতে হবে ।

—আপনি ঠিক আমার ছোট বোনের মতো করছেন । কী ভাল গান গায়, কেউ শুনতে চাইলেই বলে আইসক্রিম খেয়ে গলা ভেঙে গেছে ।

চাপের মুখে অদিতিকে আনতেই হল গল্পটা । সবে পাতা খানেক পড়েছে দস্যুর মতো হাজির হল তাতাই । ঢুকেই অতিথিদের দেখে তার মুখ শুকিয়ে আমসি ।

হেমেন বললেন, —কী ছোটেমাস্টার, এমন ভগ্নদূতের দশা কেন ?

কেঠো হাসি হাসল তাতাই, —আপনারা টিভি খোলেননি ? ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার খেলা দেখাচ্ছে ।

—ওহো, তাই তো । রঞ্জন ঘড়ি দেখল, —আটটায় আরম্ভ হওয়ার কথা না ?

তাতাই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, —আপনি দেখবেন ?

—দেখলে হত । কিন্তু তোমার মা-র গল্পটা যে শুনছি ভাই ।

তাতাই একবার আড়চোখে তাকাল অদিতির দিকে, —খেলাটা দেখে নিয়ে শুনুন ।

—না। তা হলে আমার দেরি হয়ে যাবে। কাল সকালে তো রিপ্লে দেখাবে, তখন দেখে নেব।

হেলেঞ্চা পাতা খাওয়া মুখ হয়ে গেল তাতাইয়ের। গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েছে সোফায়। উসখুস করছে। টেবিলে পড়ে থাকা চানাচুর থেকে ঘন ঘন বাদাম তুলে খাচ্ছে।

হেমেনের বোধহয় প্রাণে দয়া জাগল। বললেন, —আমরা কি অন্য কোথাও বসে গল্পটা শুনতে পারি না অদিতি? ছোটেমাস্টার নয় খেলা দেখুক।

অদিতি এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ছেলেদের ঘরে গিয়ে বসা যায়, সেখানে আবার পাপাই এসে পড়তে পারে। নিজেদের ঘরে বসবে?

তাই বসল। খাটের ওপর জমিয়ে বসেছেন হেমেন, পাশে রঞ্জন। তাদের মুখোমুখি বসে গল্পটা পড়ছিল অদিতি। পড়তে পড়তেই টের পেল সুপ্রতিম ফিরেছে, দরজায় এসে দাঁড়ালও একবার, হেমেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সৌজন্যের হাসি হেসে সরে গেল। ছেলের পাশে বসে টিভি দেখছে।

রঞ্জন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল লেখাটার, হেমেনমামা অতটা না। রঞ্জনের মতে গল্পটা বড় কোনও পত্রিকায় পাঠানো উচিত, হেমেনমামা চান গল্পটা আরেকবার লিখুক অদিতি। পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর লেখিকা যে অনুভূতিটা নিয়ে ফিরছে সেটা আরও তীব্র হওয়া প্রয়োজন। রঞ্জন গল্পের কোনও বদল চায় না, অতি স্বাভাবিক সমাপ্তিতেই সে বেশি অভিভূত।

আলোচনা করতে করতে সময় গড়িয়ে গেল। হেমেনরা উঠলেন রাত সাড়ে নটায়।

খুশি খুশি মেজাজে খাবার থালা সাজাচ্ছে অদিতি। তখনই বিস্ফোরিত হল সুপ্রতিম। পাপাই তাতাইয়ের সামনেই।

—আমি জানতে চাই এ-সবের অর্থ কী? যে কেউ আসবে, বেডরুমে ঢুকে যাবে, আমার বাড়ির কি একটা প্রাইভেসি নেই?

অদিতি বিমূঢ়, —তাতাই খেলা দেখছিল তাই...একদিন একটু ঘরে বসে গল্প পড়েছি!.... হেমেনমামা প্রায় আমাদের ঘরের লোক... !

—ও-সব হেমেনমামা ফেমেনমামা বুঝি না। ওই যে সখী সখী চেহারার দেড়েল ছেলেটা খাটে উঠে বসেছিল, সেও কি ঘরের লোক?

অদিতি তপ্ত হল এতক্ষণে, —ঘরে কি আজ প্রথম বাইরের লোক ঢুকল? তোমার সোমেন তথাগতরা এসে কি সারাক্ষণ ড্রয়িংরুমে বসে থাকে?

—আমার বন্ধুদের সঙ্গে ওই রাস্তার হ্যাগার্ডদের তুলনা? সমস্ত বাড়াবাড়ির একটা লিমিট থাকা উচিত। ফের যদি কোনওদিন আমার ঘরে বাইরের লোক ঢোকাতে দেখেছি...

অদিতি অপমানে ম্লান হয়ে গেল। সাংসারিক তুচ্ছ কারণে বহুবার অজস্র বিবাদ হয়েছে তাদের, এইটুকু ফ্ল্যাটে পাপাই তাতাইয়ের কাছে তা সব সময়ে

আড়ালও থাকে না, তা বলে এই ভাষায় কথা বলল সুপ্রতিম ? এত অকিঞ্চিৎকর কারণে ? চেনা মানুষ কি করে এমন অচেনা দানব হয়ে যায় ?

মলিন মুখে ছেলেদের খেতে দিল অদিতি। সুপ্রতিমকেও। পাপাই তাতাই গম্ভীর, সুপ্রতিমের ভ্রূক্ষেপ নেই, খাচ্ছে সে। শব্দ করে করে স্টিলের থালায় মাংসের হাড় ঠুকল, চুষে চুষে নরম শাঁসটুকু বার করে নিল। ল্যাংড়া আমের আঁটি নিপুণভাবে শেষ করে তৃপ্তির উদ্‌গার তুলছে।

খাওয়া শেষে বিছানায় নিঃসাড়ে শুয়ে আছে অদিতি। বাইরে এক নিষ্করুণ গুমোট। ঘরেও। পাখার হাওয়াতেও ঘাম জমছে গায়ে, খসখস করছে দেহ।

আলো নিবিয়ে সুপ্রতিম ঠেলল অদিতিকে, —অ্যাই।

অদিতি কাঠ হয়ে রইল।

সুপ্রতিম টানল অদিতিকে, —খুব রাগ করেছ ?

নিজেকে আরও শক্ত করল অদিতি।

অদিতির মাথা মুখেব খুব কাছে নিয়ে এল সুপ্রতিম। অভ্যস্ত নিশ্বাসপ্রবাহে অভ্যস্ত উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। কোমল জড়ানো স্বরে সুপ্রতিম বলল, —বাগ করো কেন ? তুমি আমাকে একদিন অপমান করেছিলে, আমি তোমাকে কাউন্টার ইনসাল্ট্ করে দিলাম। কাটাকুটি হয়ে গেল।

অদিতির রক্তস্রোত থেমে গেছে অকস্মাৎ। নিজের মিথ্যে আর অন্যায়ের সঙ্গে অদিতির আজকের সরল উচ্ছ্বাসকে এক দাঁড়িপাল্লায় বসাতে চাইছে এ কোন্ সুপ্রতিম ! তেইশ বছর পরেও পরিচিত ঘ্রাণ কেন আজ অজানা লাগে !

অদিতি ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। পাশ ফিরে শুল। ভাঙা স্বরে বলল, —ঘুমোও।

॥ দশ ॥

সকালে পাখিকে জল ছোলা দিতে গিয়ে শিউরে উঠল অদিতি। ব্যালকনিতে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট পালক, খাঁচা ঢাকার কাপড় মেঝেতে লুটোচ্ছে। টিয়া টলছে খাঁচায়। বাঁ ডানায় তার গভীর ক্ষত, সবুজ শরীরে ছোপ ছোপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।

মেরেই দিল পাখিটাকে ?

সুপ্রতিমের সঙ্গে অদিতির সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক হয়নি, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পরস্পবের কথা হয় না। যাও বা হয়, ভাববাচ্যে। ক্রিয়াপদবিহীন। অফিস যাওয়ার আগে সুপ্রতিম হয়ত চেঁচিয়ে বলল, মোজা ? রান্নাঘর থেকে অদিতি উত্তর দিল আলনার পেছনে। রাত্রে হয়ত সুপ্রতিম প্রশ্ন করল, কখন খেতে বসা হবে ? অদিতি জবাব দিল, টেবিলে বসলেই দেওয়া হবে। কখনও আবার সরাসরিও নয়, কথা চলছে ছেলেদের মাধ্যমে। তাতাই জিজ্ঞেস কর তো, ছোটপিসির বাড়িতে কি অফিস থেকেই চলে যাবে, না এখানে এসে

যাবে ? পাপাই বলে দে, রিঙ্কির জন্মদিন পরশু, কাল ভেবে ডিসাইড করা হবে।

ছোট্ট একটা ঝাপটাও অনেক সময়ে বুকের পাষাণভার নামিয়ে দেয়।

অদিতি সব ভুলে আর্তনাদ করে উঠল,—এই শুনছ, শিগগির একবার এদিকে এসো।

ঘুমচোখে দৌড়ে এসেছে সুপ্রতিম। পাখির রক্তাক্ত দশা দেখে তারও চক্ষু স্থির।

নিজের অজান্তে অদিতি খামচে ধরেছে সুপ্রতিমকে। থরথর কাঁপছে,—কী হবে এখন ? ও কি মরে যাবে ?

সুপ্রতিম খাঁচার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখছে পাখিটাকে। দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো বলল,—অত ভেঙে পড়লে চলবে ? কিছু তো একটা করতেই হবে।

—কী করব ?

খাঁচার দরজা খুলল সুপ্রতিম। পাখিকে একবার ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল,—ইস, জোর চোট লেগেছে। মারল কী করে বলো তো ?

অদিতি প্রায় কেঁদে ফেলল,—বুঝতে পারছি না। কিছু একটা করো প্লিজ়।

—এই হল গিয়ে পাখি পোষার বখেড়া। কতবার বলেছি পুষতে হলে অ্যালসেশিয়ান পোষো, ডোবারম্যান পোষো, কেউ কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তা নয়, পাখি ! যাও, একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এসো।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটল অদিতি। তোয়ালের সঙ্গে সঙ্গে পাপাই তাতাইকেও ঘুম থেকে তুলে এনেছে। সন্তর্পণে পাখিটাকে তোয়ালেতে তুলে নিয়েছে সুপ্রতিম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঘাতটা দেখছে। অদিতির টিয়া একেবারে নির্জীব, গলায় শব্দটি নেই, একবার করে তাকাচ্ছে আর চোখ বুজে ফেলছে।

পাপাই বলল,—ও বাঁচবে না। খাবি খাচ্ছে।

তাতাই বলল,—না না, বেঁচে যাবে। চোটটা ডানার ওপর দিয়ে গেছে।

—পাখিদের ডানাটাই আসল।

—মোটেই না, ডানা ছাড়াও পাখি বাঁচতে পারে। মেন হল বডি। হার্ট লাঙস্ ব্রেন অ্যাবডোমেন্। ... শরীরের কোথাও তেমন ইনজুরি হয়নি।

—স্টিল, ডানা চলে গেলে পাখির আর পাখিত্ব রইল কি ?

সুপ্রতিম বলল,—তর্ক থামিয়ে কাজের কাজ কিছু কর। তোর মার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আমাদের কোম্পানির অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম আছে, জলদি নিয়ে আয়।

—তার আগে একটু ডেটল দিয়ে ওয়াশ করে নিলে ভাল হত না বাবা ?

—না বাবা, ডেটলে ভীষণ জ্বালা করবে। তার থেকে গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল।

সুপ্রতিম বলল,—আমাদের ক্রিম লাগালে জল ডেটল কিছু লাগে না। তুমি

যাও তো, ক্রিমটা নিয়ে এসো তো।

দিশেহারা অদিতি ছুট্রে ক্রিম নিয়ে এল।

পাখির পরিচর্যা চলছে। বাপ আর দুই ছেলে মিলে ওষুধের প্রলেপ লাগাচ্ছে পাখির ডানায়। অবিরাম মন্তব্য চলেছে। ডাক্তারি শাস্ত্র এমনই একটা বিষয় যাতে প্রতিটি মানুষেরই অগাধ জ্ঞান। তবে একজনের সঙ্গে আর এক জনের জ্ঞান কিছুতেই মিলতে চায় না। একজন যদি বলে ব্যান্ডেজ করে দাও, অন্য জন বলে খোলা থাকাই ভাল। পাপাই বলল বেবি ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো উচিত, তাতাই বলল পেইনকিলার। ছেলেদের মতে পাখিকে এক্ষুনি কোনও ভেটেরিনারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। সুপ্রতিমের মত, কিচ্ছু লাগবে না, তার ক্রিমেই পাখির ক্ষত শুকিয়ে যাবে। বরং আয়রন টনিক ড্রপারে করে খাইয়ে দেওয়া হোক, রক্ত তৈরি হবে তাড়াতাড়ি।

পশুপাখি জীবজন্তুর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কেও বাপ ছেলেদের পাণ্ডিত্য কম নয়। সবাই অভিজ্ঞ মতামত জানাচ্ছে।

পাপাই ব্যালকনির গ্রিলটাকে এরকুল পোয়ারোর মতো তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল,—এইটুকু ফাঁক দিয়ে বেড়াল ঢুকল কী করে ? আমার মনে হয় ব্যাটা কোনওভাবে বাড়ির ভেতরেই ছিল।

—কী বুদ্ধি ! তাতাই ভেংচে উঠল,—ভেতরে থাকলে বেরিয়েই বা গেল কী করে ? বেড়াল কি দরজার ছিটকিনি খুলে ব্যালকনিতে এসেছিল ? বেড়ালের বডি খুব ফ্লেক্সিবল্ হয়। এইটুকু সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়েও গলে আসতে পারে।

সুপ্রতিম বলল,—আমি শিয়োর, বেড়াল যখন অ্যাটাক করে, পাখিটা নির্ঘাত গাধার মতো ঘুমোচ্ছিল। না হলে একটা চিৎকার-টিৎকার অন্তত করত।

—খাঁচার বাইরে থেকে মারল কী করে বলো তো ?

—পাখিটা নিশ্চয়ই সাইডে ছিল, ইজিলি থাবা মেরে দিয়েছে। বেড়ালের থাবা খুব সুইফ্ট চলে। ইন্ফ্যাক্ট ডোমেস্টিক অ্যানিমেলের মধ্যে বেড়ালই সব থেকে ফাস্ট মুভিং ক্রিচার।

—এবং সব থেকে শয়তান। সাংঘাতিক বেইমান। তুই একটা বেড়ালকে বেবি অবস্থা থেকে দুধটা মাছটা খাইয়ে বড় কর, দেখবি চান্স পেলে তোর কিচেনই সাফ করে দিচ্ছে। চোখে চোখে কেমন তাকিয়ে থাকে লক্ষ করিসনি ? সব সময়েই কেমন বেপরোয়া অ্যাটিচিউড্।

অদিতি নির্বাক শুনছিল। তার আর্দ্র চোখ পাখিতে স্থির। আহত টিয়াকে দেখার পর থেকেই হাত পা কেমন অসাড় হয়ে গেছে তার। স্বামী ছেলেরা খুব যত্ন করেই পরিচর্যা করছে পাখির, পাখিসুদ্ধ খাঁচাটাকে ফ্ল্যাটের অন্দরে নিয়ে এসেছে। পাখিটাকে ছুঁতে কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না অদিতির। কাজে মন বসছে না, বুকের ভেতর টিপ-টিপ করছে একটা কষ্টের দানা, ঘুরে ফিরে অদিতি

দেখে যাচ্ছে টিয়াকে। নড়ে না টিয়া, ঝিমিয়ে আছে।

বড় মায়া। বড় মায়া।

অফিস বেরোনোর আগে সুপ্রতিম অদিতির কাঁধে হাত রাখল,—মন খারাপ কোরো না। তোমার পাখি ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্চর্য, অত বড় আঘাতটাও সামলে উঠল অদিতির টিয়া, বেঁচে গেল। সুপ্রতিমের মলমের গুণেই হোক, অদিতির মায়ার টানেই হোক, কী পাপাই তাতাই-এর দেখভালেই হোক, অথবা নিজেরই জীবনীশক্তির জোরে একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠল টিয়া। ক্ষত শুকোল, নিস্তেজ পাখি চাঙা হল ধীরে ধীরে। প্রথম দু দিন টিয়া মুখে তোলেনি কিছু, ড্রপারে করে তাকে গ্লুকোজের জল খাইয়ে টিকিয়ে রাখল তাতাই। তৃতীয় দিন থেকে ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ জাগল টিয়ার, নিজে নিজেই ঠোঁট ছোঁয়াল ছাতুতে। তার ডানা বেশ কমজোরি হয়ে গেছে, তবু নাড়ে মাঝে মাঝে, একটুখানি ছড়িয়ে রেখে দাঁড়ে উঠে বসে।

শেষে একদিন স্বরও বেরোল। কর্কশ নিনাদ, তবু কী মধুর ! যেন শুধু ডাক নয়, বেঁচে থাকার এক প্রবল ঘোষণা।

টিয়ার আততায়ীকে শনাক্ত করেছে তাতাই। পরদিনই। সেটা এক চ্যাপ্টামুখো হুলো বেড়াল, গোটা বিল্ডিং কমপ্লেক্সে তার প্রবল দাপট, অনেক ফ্ল্যাটই তার ডাকাতির জ্বালায় অতিষ্ঠ। তবে সে হুলোও সেদিন রাত্তিরে পুরোপুরি রেহাই পায়নি, টিয়াও তার চোখের নিচে ঠোক্কর মেরে গর্ত করে দিয়েছে। তাতাই স্থির করেছে, হুলোটাকে দেখতে পেলেই পেটাবে।

পাখির চিন্তায় অদিতি কদিন লেখা নিয়েও বসতে পারেনি। দুপুর হলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থেকেছে চুপচাপ। সে সময়ে হুলোটাকে অনেকবার চোখে পড়েছে তার। গালে একটা কুৎসিত ঘা নিয়ে বিমর্ষ মুখে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের কার্নিশে মুখ গুজে বসে থাকে। বেড়ালটার জন্যও অদিতির কেমন মায়া হয়। আহারে বেচারা নিজেও জানে না তার আচরণ কত নির্মম ! কী করবে বেড়াল, পাখির সঙ্গে চিরকাল যে তার খাদ্যখাদকের সম্পর্ক, সেই চোখেই তো সে দেখে এসেছে পাখিকে ! মগজহীন বেড়ালটা যদি বুঝত তাদের আদি বাসভূমি বনজঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে ওই পাখিরই ঠোঁটে ঠোঁটে !

অদিতি ছোট ছেলেকে বলে,—বেড়ালটাকে মারিস না রে তাতাই। ও ওর মতোই থাক। ও কি বোঝে কোন কাজটা ভাল, কোন কাজটা খারাপ ?

সুপ্রতিম শুনে হাসে খুব। বলে,—এবার তুমি ওই বেড়ালের চিকিৎসাতেও নেমে পড়বে না কি ? বলো তো অফিস থেকে আরও কয়েকটা ক্রিম নিয়ে আসি।

সুপ্রতিমের সঙ্গে অদিতির সম্পর্ক আবার মসৃণ। ছোট্ট একটা ঢেউ এসেছিল, ফিরে গেছে। সংসার তো এরকমই। ঢেউ আসে, ফেনা রেখে চলে যায়। ফেনাও শুকোয় ক্রমশ, পড়ে থাকে সিক্ত বেলাভূমি। আবার সেখানে

নিশ্চিন্তে পা ফেলে মানুষ, বালুতটও প্রতীক্ষা করে নতুন ঢেউয়ের। অদিতি এক সামান্য মানবী মাত্র, তার ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন ?

সব কিছুই নিয়মমতো চলছে আবার। লিখছে অদিতি। হেমেন একদিন এসে একটা গল্প নিয়েও গেলেন, বড় কোনও পত্রিকায় পাঠাবেন। সুপ্রতিম টুক করে আড়াই দিনের জন্য রাঁচি ঘুরে এল। তাতাইয়ের এখনও গরমের ছুটি চলছে, কিন্তু সারা দিনে তার টিকি পাওয়া মুশকিল। পাপাই সামনের সপ্তাহে বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে, দিন দশেকের জন্য। মাঝে হঠাৎ এক রবিবার সন্ধেতে সুজাতা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হাজির। মেয়ে নিয়ে। সারা সন্ধে আড্ডা মেরে গেল অদিতি সুপ্রতিমের সঙ্গে। খুব হাহা হিহি করল। সুপ্রতিমের মুখে অদিতির গল্প লেখার গল্প শুনে সুজাতা এই মারে তো সেই মারে। কী অসভ্য রে তুই ? আমাকে সেদিন বলিসনি কেন ? দে দে, তোর লেখাগুলো দে, পড়ে ফেরত দেব। সুজাতার মেয়েটাও দারুণ সপ্রতিভ, চোখেমুখে কথা, তাতাইয়ের মতো বক্তৃতাবাজও মুনিয়ার কথার তোড়ে কাহিল। অদিতিকেও কম অপ্রস্তুতে ফেলল না মেয়েটা। ও মাসি, তুমি কী নিষ্ঠুর গো ! পাখিটাকে খাঁচায় বন্ধ করে রেখে দিয়েছ ! সুপ্রতিমের খুব মজা লেগেছে শুনে। বন্দি থেকে থেকে ও পাখির কি আর ওড়ার ক্ষমতা আছে ! খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলেও দু পা গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে।

এ বছর জোর বর্ষা নেমেছে। গ্রীষ্মের তীব্র দাহের পর বর্ষা এবার একটু দেরিতেই এল। আকাশ এখন সর্বক্ষণই সীসে বরণ, মেঘের ভারে নেমে এসেছে নীচে। দেরিতে আসার ঘাটতি বর্ষা পুষিয়ে দিচ্ছে পুরোমাত্রায়। একের পর এক নিম্নচাপ চলছে, টানা বৃষ্টিতে পথঘাট থই থই, এক এক সময় কলকাতাকে ভেনিস বলে ভ্রম হয়। শুধু রাস্তায় গণ্ডোলাই নেই, এই যা। সূর্য এখন এক নিরুদ্দিষ্ট নক্ষত্র, এই বুঝি কাগজে টিভিতে তার সন্ধান চেয়ে ছবি বেরোয় !

বৃষ্টির বিকেলে সুপ্রতিমের আধভেজা শার্টপ্যান্ট ইস্ত্রি চালিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছিল অদিতি। সুপ্রতিমরা নতুন একটা শ্যাম্পু ছাড়ছে বাজারে, সেই উপলক্ষে কাল সন্ধেবেলা বড়সড় পার্টি দিচ্ছে কোম্পানি। সঙ্গে ফ্যাশান প্যারেড। চুল ফাঁপিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে হাঁটবে সুন্দরীরা। অনুষ্ঠানে এই শার্টটাই পরে যেতে চায় সুপ্রতিম। মোড়ের ইস্ত্রিঅলাটা বসছে না কদিন, সে বোধহয় সূর্যের খোঁজে গেছে।

ডোরবেল বাজল।

দরজা খুলে অবাক হয়েছে অদিতি। দাদা এসেছে। এই বর্ষায় দাদা !

অলকেশের এক হাতে ভেজা ছাতা, অন্য হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেট, বগলে পেটমোটা চামড়ার ব্যাগ। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে হাসল অলকেশ,—চমকে গেলি তো ?

অনেক দিন আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে যাওয়া হয়নি অদিতির। শেষ

গিয়েছিল মাস দুয়েক আগে। দাদা সেদিন বাড়ি ছিল না, ছুটির দিনে কোনও এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

দাদাকে দেখে অদিতি খুশিই হল। বলল,—চমকানোরই তো কথা। এরকম বৃষ্টি মাথায় করে কেউ আসে !

—কী করি, তুলতুলিটার ইউনিভার্সিটি বন্ধ, বহুদিন তোদের খোঁজখবর পাই না। ...

অলকেশের ছাতা বাথরুমের সামনে মেলে দিয়ে তোয়ালে এনে দিল অদিতি,—নে, আগে ভাল করে মাথা মোছ। এই সেদিন পা ভাঙলি, এই জলকাদায় আবার ...

অলকেশ বোনের বাড়িতে আসে কম, তবে এলে কখনও খালি হাতে আসে না। প্লাস্টিকের ঠোঙা অদিতির হাতে দিয়ে বলল,—হাঁটু আমার পুরো সেরে গেছে। আয় আমরা ভাইবোনে আজ একটু বেগুনি আলুর চপ খাই। তোর ছেলে দুটো কোথায় গেল ?

—এই বিকেলে ওরা বাড়ি বসে থাকবে ! কোথায় চরে বেড়াচ্ছে। পাপাইটা তো আবার সোমবার দার্জিলিং যাচ্ছে।

—বর্ষায় দার্জিলিং যাচ্ছে কী রে ! কোথায় কখন ধস্ নামে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায় ...

—আমরাও তো সেই চিন্তা। কে শোনে ! বর্ষায় নাকি দার্জিলিং-এর আলাদা চার্ম।

—কী চার্ম ?

—সে ওরাই জানে। বোস্, চা করে আনি। আমার রান্নার মেয়েটা এ-বেলা বোধহয় ডুব মারল।

তোয়ালেতে মুছে ব্যাগ সেন্টার টেবিলে রাখল অলকেশ। ঘষে ঘষে মাথা মুছছে। সোফায় বসেও উঠে দাঁড়াল, হাত বুলিয়ে দেখল সোফা ভিজছে কি না। ভেজেনি। নিশ্চিন্ত হয়ে হেলান দিয়েছে।

গ্যাসে জল বসিয়ে ভাবছিল অদিতি। দাদা তো কারণ ছাড়া এ বাড়িতে বড় একটা আসে না ! এই দুর্যোগের দিনে যখন এসেছে, দরকারটা নিশ্চয়ই জরুরি। মুখটা শুকনোও লাগছে যেন ! অদিতি গলা তুলল,—তুই কি অফিস থেকে আসছিস ?

—হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। তোর এখানে আসব বলে।

—তা হলে তো তোর খিদে পেয়েছে। কটা লুচি ভেজে দিই ?

—না না, তোকে আর হ্যাঙ্গাম করতে হবে না। মুড়ি থাকলে দে।

অদিতি সামান্য অস্বস্তিতে পড়ল। এ বাড়িতে তার দুই ছেলের কেউই মুড়ি ছোঁয় না। বাঘের ঘাস খাওয়ার মতো সুপ্রতিম ন মাসে ছ মাসে খায়, তার জন্য এই বর্ষার দিনে ঘরে মুড়ি কিনে রাখার কোনও মানেই হয় না।

অদিতি আবার বলল,—লুচি ভেজে দিই না ? সেই কখন ভাত খেয়েছিস ...

—ঘরে বুঝি মুড়ি নেই ? দু-এক মুহূর্ত উত্তরের প্রতীক্ষায় থেকে অলকেশ বলল,—তোকে ব্যস্ত হতে হবে না, চা তেলেভাজা নিয়ে চলে আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি।

—কী জিনিস ?

—আছে। আয় না।

পলকের জন্য বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল অদিতির। দাদা যখনই কোনও কাগজ সই করাতে আসে এই ভাষাতেই কথা বলে। এরকমই নরম সুরে। মা-র একটা এন এস সি ছিল না ? ম্যাচিয়োর করল ? সুপ্রতিম নেই আন্দাজ করেই কি এই বিকেলবেলা... ! ছোট্ট শ্বাস ফেলল অদিতি। নিজের দাদার সঙ্গে এই তিক্ততা আর ভাল লাগে না।

বড় প্লেটে তেলেভাজা সাজিয়ে চা নিয়ে দাদার সামনে বসল অদিতি,—দেখি কী জিনিস।

—দেখাচ্ছি। নিচু হয়ে গোটানো প্যান্টের ভাঁজ খুলছে অলকেশ,—তোদের এখানে এবার জল জমেনি দেখছি !

—করপোরেশানের দয়া হয়েছে। রাস্তা উঁচু করে দিয়েছে। আমাদের ফ্ল্যাটের পেছনেই এখন কাউন্সিলার থাকে যে।

—তাই বল।

—তোদের রাস্তা তো ডুবে আছে। তোর বাড়িতে এবার জল ঢোকেনি ?

অলকেশ পলকের জন্য স্থবির,—কত দিন বারণ করেছি না খুকু, তোর বাড়ি তোর বাড়ি করবি না ?

অদিতি আলুর চপে কামড় দিয়ে বলল,—বাহ্, বাড়ি তো তোরই। বললেই দোষ ?

—না খুকু। ওটা আমাদের বাড়ি। তোরও। আমারও। অলকেশ বড় করে একটা নিশ্বাস টানল,—কাগজে-কলমে লেখাপড়া করা না থাকলে কি অধিকার চলে যায় ? বাড়ি সারাইটারাই করার জন্য অফিসের লোন নিতে অনেক প্রবলেম হয়, তাই আমার নামে ...

যুক্তি, না ভাবের ঘরে চুরি ? অদিতি খুচ করে খোঁচা দিল,—বাড়ি কিন্তু তুই একবারও সারাসনি দাদা। ও সব কথা থাক। কী দেখাবি বলছিলি দ্যাখা।

অলকেশ ঝিম মেরে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি নেমেছে আবার। চায়ের কাপ হাতে ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে রয়েছে অলকেশ। ব্যালকনির এ-পাশে ছোট্ট প্যাসেজে পাখির খাঁচা ঢুকিয়ে রাখা আছে, সেদিকেও দৃষ্টি ফেলে রাখল কিছুক্ষণ। কাপ নামিয়ে ফোলিও ব্যাগটা টেনেছে কোলে। চেন খুলে একটা বাদামি কাগজের মোটা প্যাকেট বার করল।

অদিতি জিজ্ঞাসা করল,—কী ওটা ?

—খুলে দ্যাখ।

মোড়ক খুলতেই জোর এক ঝাঁকুনি খেয়েছে অদিতি। খাতা ! খাতা ! তার

সমস্ত পুরনো গল্প লেখার খাতা। স্কুলের। কলেজের। খাতার নীচে তার স্কুল কলেজের ম্যাগাজিনও আছে কয়েকটা।

অদিতি বিহ্বল স্বরে বলল,—কোত্থেকে পেলি এগুলো ?

অলকেশের মুখে মেঘলা বিকেলের হাসি,—তুই আবার লেখা ধরেছিস ... মা-র কালো ট্রাঙ্কে গাদা হয়ে পড়েছিল ... খুঁজে খুঁজে বার করলাম।

দ্রুত হাতে একের পর এক খাতা উল্টোচ্ছে অদিতি। কোনও পাতায় শুধুই কাটাকুটি। কোথাও বা অপটু হাতে আঁকা মেয়েলি মুখের ছবি, দেখে কার্টুন মনে হয়, তলায় কোনও বান্ধবীর নাম। কোনও পাতায় একই লাইন বিশ পঁচিশবার লেখা। কবিতা। গল্প। উপন্যাসের ছক, পাশে পাত্রপাত্রীদের সম্ভাব্য চেহারা আর গুণাগুণ। একটা পাতায় অতিকায় হরফে অদিতিরই হাতে লেখা—অদিতি তুই একটা হাঁদি। তোর দ্বারা লেখা হবে না। কলেজ ম্যাগাজিনে কুয়াশা গল্পটাও রয়েছে।

অদিতি আঙুল বোলাচ্ছে পাতায়, অক্ষরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। অক্ষর, না প্রাণ ? অক্ষর, না সময় ? অক্ষর, না স্মৃতি ? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাতারা বিবর্ণ, হলদেটে, নীল কালির আঁচড় ফিকে অনেক, তবুও কী মুখর ! অসংখ্য স্মৃতি ছুটে এল টগবগিয়ে, তিরতির করে, দুলতে দুলতে। অদৃশ্য এক কুবো পাখি ডেকে চলেছে বুকে। কুব কুব কুব কুব।

অলকেশ মৃদু স্বরে বলল,—তুই খুশি হয়েছিস খুকু ?

অদিতি চোখ তুলল। দাদাকে দেখছে অপলক। তিপান্ন বছরের দাদাকে নয়, চোদ্দ বছরের দাদাকে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বোনের জন্য হজমিগুলি এনেছে দাদা, খাওয়া শেষে কাগজ চাটছে বোন।

ছ বছরের মেয়ের মতো কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় হেলিয়ে দিল অদিতি। আধফোটা স্বরে বলল,—শুধু এটা দেওয়ার জন্য এই দুর্যোগের দিনে এত দূর ছুটে এলি।

—ভেবেছিলাম তুলতুলির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। অলকেশও যেন অনেকটা বছর পিছিয়ে গেছে। বলল,—তোর জন্য হঠাৎ বড় মন কেমন করছিল রে। ভাবলাম কত দিন তোকে নিজে হাতে কিছু দিইনি। তোর কাছ থেকে শুধু নিয়েই গেলাম।

অদিতির চোখে এক অসহ্য চাপ। এই বুঝি ফিন্‌কি দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

—ছোটমামাও সেদিন বলছিল তুই নাকি খুব ভাল লিখছিস। তুলতুলিও তোর কথায় পঞ্চমুখ। আমি ছাপোষা মানুষ, সাহিত্য-টাহিত্য অত বুঝি না, তবু শুনলে বুকটা ফুলে ওঠে। সময়টা হারিয়ে ফেলেছিলি, ফিরে পেয়েছিস, লেখ, আরও লেখ।

অলকেশ উঠে পড়েছে। ভিজে ছাতা হাতে ঝুলিয়ে নিল, চিমসে যাওয়া ফোলিও ব্যাগ আবার চেপেছে বগলে। ফিরে যাচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে অদিতি দেখছিল দাদাকে। ধীরে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

যাচ্ছে দাদা। অদিতি চিৎকার করে একবার ডাকতে চাইল অলকেশকে। সেই শৈশবের স্বরে।

স্বর ফুটল না।

ল্যান্ডিং-এর বাঁকে হারিয়ে গেল অলকেশ। অদিতির গরিব স্বার্থপর দাদা।

বৃষ্টি নেই। ফ্ল্যাটময় ফিরে বেড়াচ্ছে এক স্যাঁতসেঁতে বাতাস। সেন্টার টেবিলে ছড়িয়ে আছে অদিতির খাতা। নাকি মণিমুক্তো।

দাদা কি এর চেয়েও বেশি কিছু নিয়ে গিয়েছিল অদিতির কাছ থেকে ?

পায়ে পায়ে খাঁচার ধারে গেল অদিতি। খাঁচার দরজা খুলে টিয়ার পিঠে আলতো হাত রাখল। এই প্রথম পাখিটাকে সাহস করে স্পর্শ করছে অদিতি।

ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাচ্ছে, পাখির দেহে আবার পেলব শ্যামলতা, তবু পাখি ছিট্‌কে যায় ভয়ে। ছোট্ট ছোট্ট ঠোকর মারছে অদিতিকে।

অদিতির ব্যথা লাগছিল না।

॥ এগারো ॥

সিঁড়ির নীচে সার সার লেটারবক্স। আটটা ফ্ল্যাটের আটটা। মজুমদার লেখা বাক্সে আজ অনেক চিঠিপত্র। পাপাই সুপ্রতিমের নামে বড় বড় দুটো খাম। ইনসিয়োরেন্স-এর নোটিস। ইলেকট্রিক বিল। লখনউ থেকে সুপ্রতিমের ভাইয়ের চিঠি, ইন্‌ল্যান্ডে।

ইলেক্‌ট্রিক বিলের অঙ্ক দেখে ভুরু কুঁচকোল অদিতি। তিনশো বাহান্ন। গত মাসে তিনশো এগারো ছিল না! মানে একচল্লিশ টাকা বেশি। একই তো কারেন্ট পোড়ে, এত তফাত কী করে যে হয়!

অদিতি চোখ ছোট করে পাপাইয়ের খামের প্রেরকের নাম পড়ল। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি। প্রায়শই বিদেশ থেকে এরকম খাম আসছে পাপাইয়ের। গত মাসে কী এক ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছিল, আরিজোনা না ওরিগন। ভেতরে ছিল ইয়া মোটা বুকলেট্‌। মা খাম খুলে দেখেছে বলে কী উষ্মা ছেলের! অন্যের চিঠি খোলা কিন্তু খুব বাজে হ্যাবিট মা! পাপাই কি বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে ? ভাঙে না কেন ? থাক পড়ে, এ চিঠি পাপাই দার্জিলিং থেকে ফিরেই খুলবে।

সুপ্রতিমের খামটাও খুলে দেখার দরকার নেই। এ হল এক রহস্যময় রাজেশ গুলাটির কাছ থেকে আসা অদরকারি কাগজ, অদিতি জানে। সুপ্রতিম একে চেনে না, কোত্থেকে লোকটা সুপ্রতিমের ঠিকানা পেয়েছে তাও জানে না, কিন্তু অজ্ঞাত শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো লোকটা মাঝে মাঝেই কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয় সুপ্রতিমকে। হাজারো কোম্পানি প্রতিদিন যে শেয়ার ছাড়ছে বাজারে, সেই সব শেয়ার কেনার কাগজ এগুলো। প্রায় প্রতিবারই সময় পার করে পৌঁছোয় কাগজ, সুপ্রতিম এক ঝলক দেখে ওয়েস্টপেপার বাস্‌কেটে ফেলে দেয়।

দৈবাৎ কখনও সময়মতো এলে অসীম কৌতূহল নিয়ে বিনিয়োগে লাভ আর ঝুঁকির সম্ভাবনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। এবং ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। শেয়ার কেনার জন্য অফিসে নিজস্ব পরিচিত লোক আছে সুপ্রতিমের। এ খামও বাজে কাগজের ঝুড়িতে যাবে। বেচারা রাজেশ গুলাটি!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অদিতি দেওরের চিঠিটা পড়ছিল। দাদা বউদি দুজনকে এক সঙ্গে চিঠি লিখেছে পার্থপ্রতিম। জা কাবেরীও। নেহাতই ঘরোয়া চিঠি। বাবাই ক্লাশ সেভেনে উঠেই স্কুলের হকি টিমের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে, দিবারাত্র এখন স্টিক নিয়ে ছুটছে। কাবেরীর লু লেগে গিয়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল ছ সাত দিন, বৃষ্টি নামার পর সে এখন সুস্থ। এবার হয়তো পুজোয় পার্থপ্রতিমরা কলকাতা আসতে পারে, তবে দিন সাতেকের বেশি থাকা হবে না, বাবাইয়ের স্কুলে ছুটি নেই। বউদির গল্প লেখা কেমন চলছে, জানতে চেয়েছে পার্থপ্রতিম। কাবেরীও। দুজনে পাপাই তাতাইয়েরও খোঁজ নিয়েছে নিয়মমাফিক। সুপ্রতিম শরীরস্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছে কি না সে সম্পর্কেও...।

অদিতি চিঠিটা পড়তে পড়তে হাসছিল মনে মনে। পার্থটা ক্রমশ কেমন নিরুত্তাপ হয়ে গেল! অথচ বিয়ের পর পার্থই ছিল শ্বশুরবাড়িতে অদিতির প্রথম বন্ধু। দুই ননদ এখন খুব সমীহ করে বটে তবে তখন তাদের চোখে অদিতি ছিল যেন শত্রুপক্ষের লোক। যেন অনাহূতের মতো এসে ভালমানুষ দাদাকে কেড়ে নিয়েছে অদিতি। কী ছেলেমানুষিই না করত ননদ দুটো! গল্প করার ছলে ইচ্ছে করে রাত দুটো অবধি আটকে রাখত অদিতিকে! পাউডার ক্রিম পারফিউম যা কিনে আনত সুপ্রতিম, খাবলা মেরে গায়েব করে দিত! পার্থ ছিল অন্যরকম। হাসিখুশি, দিলদরিয়া ধরনের। টিউশনির টাকা থেকে অদিতিকে শাড়ি কিনে দিয়েছিল একবার। কাবেরীর সঙ্গে প্রেম করার আদ্যোপান্ত গল্পও শোনাত বউদিকে। এখন সেই দেওরই কত দূরের লোক, ননদরা অনেক বেশি বন্ধু। সময় আর সংসার মানুষকে কত রকম ভাবে যে ভাঙে গড়ে!

তিনতলার ল্যান্ডিং-এ পৌঁছে অদিতি থমকাল। একটি বছর কুড়ির মেয়ে তাদের ফ্ল্যাটের দরজায়! বেল টিপছে। পরনে সালোয়ার কামিজ, কাঁধে ওড়না। বাসন্তীরঙ ওড়নার প্রান্ত পেঁচাচ্ছে আঙুলে। ঘাড় ঘুরিয়ে কল্যাণীদের বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

সেলস্ গার্ল কি? সঙ্গে তো কিছু নেই?

অদিতি তরতর করে উঠে এল,—কাকে চাই?

মেয়েটি চমকে ঘুরল,—সায়ন্তন মজুমদার এই ফ্ল্যাটে থাকে না?

—হ্যাঁ থাকে। অদিতি হাসিমুখে বলল,—আমি সায়ন্তনের মা।

—ও। মেয়েটি ঢোক গিলল,—সায়ন্তন বাড়ি নেই?

—না। ও তো দার্জিলিং গেছে।

—তাই? মেয়েটির কথার সঙ্গে খানিকটা বাতাস ঝরে পড়ল যেন। খুব

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল,—কবে ফিরবে সায়ন্তন ?

—কাল তো নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে চাপার কথা। পরশু ফিরবে।

—ও।

—সায়ন্তন ফিরলে কিছু বলতে হবে ?

—না না। মেয়েটি কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সজোরে মাথা নাড়ছে দু দিকে,—আমি পরে যোগাযোগ করে নেব।

অদিতির একটু সন্দেহ হল। মেয়েটিকে এত নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন ? গলাটাও যেন শোনা শোনা !

মন্থর পায়ে নামছে মেয়েটি, অদিতি ডাকল,—শোনো।

মেয়েটি দাঁড়িয়েছে।

—তোমার নামটা বলে গেলে না তো ?

—আম-আম-আমার ? সাযন্তনকে নাম বলতে হবে না।

অদিতির সংশয় ঘনীভূত হল। হেসে বলল,—আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি।

—শ্রেয়া।

মুহূর্তে মস্তিষ্ক হাতড়াল অদিতি। পাপাইয়ের বহু সহপাঠিনীর নাম তার শোনা, চন্দনা সুতনুকা বৈশাখী এরকম কয়েকজন এসেছেও বাড়িতে, তাদের কারও মুখে কি শ্রেয়া নামটা শুনেছে অদিতি ? অদিতির কৌতূহল বাড়ছিল। জিজ্ঞাসা করল,—তুমি সাযন্তনের সঙ্গে পড়ো ?

—ন্‌ন্‌না।

—কী পড়ো তুমি ?

—ইংলিশ অনার্স।

—সায়ন্তনদের কলেজে ?

—না। যাদবপুরে।

—থাকো কোথায় তুমি ?

—বেলেঘাটায়।

এতক্ষণে গলাটা যেন চেনা যাচ্ছে! এই মেয়েটিই কি পাপাইকে ফোন করে ?

অদিতি মেয়েটিকে আটকাতে চাইল। বলল,—ওমা, অত দূর থেকে এসেই ফিরে যাবে ? এসো, একটু বসে যাও।

—আমি বাড়ি থেকে আসছি না মাসিমা। মেয়েটির কথার গতি বেড়ে গেছে অকস্মাৎ,— কলেজে এসেছিলাম, কলেজে আজকে ক্লাশ হল না, সেই জন্য এখান থেকে একবার ...

—বারে, তা বললে কী হয়। সায়ন্তন যদি এসে শোনে তার বন্ধু দরজা থেকে ফিরে গেছে, আমাকে আস্ত রাখবে ? এসো এসো।

দরজার লক খুলল অদিতি। মেয়েটি ল্যান্ডিং-এই দাঁড়িয়ে আছে। ইতস্তত

ভাব।

গোয়েন্দা চোখে কয়েক সেকেন্ড মেয়েটিকে দেখল অদিতি। ভারী মিষ্টি মুখ। চোখ দুটো বড় বড়, টানা টানা। স্টেপকাট্ চুল মাথার পিছনে ঢেউ হয়ে আছে। চাপা সংকোচে ফর্সা মুখে লাল আভা। ঘামছেও খুব।

অদিতি ঈষৎ আদেশের সুরে বলল,—কই, এসো।

কদিন টানা বৃষ্টির পর কাল থেকে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে আকাশ। তবে মেঘ এখনও পুরোপুরি কাটেনি, ভারী শরীর নিয়ে অলস মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ হারানো সূর্য দেখা দিয়ে যায়। তার লাজুক আলোয় দুপুরের আকাশ যেন জলরঙে আঁকা ছবি। অদিতির ঘরেও এক মায়াবী আলোছায়া।

শ্রেয়া সঙ্কুচিত মুখে সোফার এক কোণে বসে আছে, ভিতু খরগোশের মতো দেখছে চারদিক, ওড়নায় ঘাড় গলা মুছছে আড়ষ্ট ভাবে।

অদিতি শরবত করে এনে শ্রেয়ার সামনে বসল,—সায়ন্তন তো সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে, তোমার সঙ্গে সায়ন্তনের আলাপ হল কী করে?

—ওদের অ্যানুয়াল ফেস্টিভাল হয়, জাভোৎসব ... ওখানেই ...

—তাই বলো। তার মানে তোমার সঙ্গে খুব বেশি দিনের বন্ধুত্ব নয়।

—নাহ্। সাত আট মাস।

—আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও। অদিতি একটু চিন্তা করার ভান করল,—তুমিই রাত্তিরের দিকে টেলিফোন করো, তাই না? সায়ন্তনের বাবা ফোন ধরলেই কেটে দাও!

শ্রেয়া শরবতে চুমুক দিয়েছিল, বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করেছে। কাশতে কাশতে লাল টকটকে হয়ে গেছে মুখ। হাঁপাচ্ছে।

শ্রেয়ার অবস্থা দেখে মজা লাগছিল অদিতির। সহাস্য মুখে বলল,—যাওয়ার আগের দিনও তো তোমার সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা হল, তখন তোমাকে বলেনি দার্জিলিং যাচ্ছে?

শ্রেয়া হঠাৎ স্থির। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে অদিতির দিকে,—আমি তো এর মধ্যে ফোন করিনি মাসিমা!

—কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তা হলে! আমার তো মনে হল তোমার গলা!

—বিশ্বাস করুন মাসিমা, দু মাসের ওপর সায়ন্তনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগই নেই।

—কেন?

শ্রেয়া উত্তর দিল না, নত মুখে বসে আছে।

মায়ের চোখে সরলতার কাজল থাকলে অনেক দৃশ্যমান জিনিসও গোচরে আসে না, আবার মাতৃ ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠলে অনেক অদেখা ছবিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঠোঁটে হাসি বজায় রেখে অদিতি বলল,—তোমাদের কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?

শ্রেয়া চুপ।

অদিতি গার্জেনের মতো বলল,—তোমার এত লজ্জা, তবু তুমি সায়ন্তনের খোঁজে বাড়ি অবধি ছুটে এসেছ ? এ তো ভারী আশ্চর্য কথা !

শ্রেয়া তবু মুখ খোলে না।

—তোমাদের শেষ কবে দেখা হয়েছিল ?

—পঁচিশে বৈশাখ।

—কোথায় ?

—আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

—কী ছবি ?

শ্রেয়া আবার চুপ।

অদিতি আর প্রশ্ন করল না। তার জেরার তোড়ে যেটুকুনি কথা বেরিয়ে এসেছে তাই যথেষ্ট। মনে হয় সেদিনই কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। পাপাইয়ের মধ্যে একটা অন্য ধরনের চাপা জেদ আছে। তাতাইয়ের জেদ অনেক খোলামেলা, বোঝা যায় তাকে। পাপাই নিজেকে সহজে প্রকাশ করে না, গোঁজ মেরে থাকে। একবার পাপাইকে আইসক্রিম খেতে মানা করেছিল অদিতি, গলা ব্যথা হয়েছিল বলে। দু তিনবার বায়না করে চুপ মেরে গেল পাপাই, কিন্তু জেদটাকে মনে মনে একটা অন্য আকার দিয়ে নিল। তারপর থেকে অন্তত কয়েক মাস অদিতি সুপ্রতিম সাধলেও প্রিয় আইসক্রিম অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করত পাপাই, হাসি মুখে।

শ্রেয়াব ওপরও কি সেরকমই কোনও অভিমান হয়েছে পাপাইয়ের ?

অদিতি বলল, —দ্যাখো, কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া হয়েছে তা যদি আমাকে না বলতে চাও, আমি জিজ্ঞেস করব না। তবে...

—আমার সঙ্গে সায়ন্তনের কোনও ঝগড়াই হয়নি মাসিমা। শ্রেয়া জড়তা কাটিয়ে হঠাৎ সোজাসুজি তাকিয়েছে।

—তা হলে ?

—আমি জানি না মাসিমা। ওইদিনের পর থেকে কোনও কারণ ছাড়াই সায়ন্তন আমাকে অ্যাভয়েড করছে। দেখা করতে বললে এড়িয়ে যায়, ফোন করলে কথা বলে না।

যথেষ্ট ঋজু থাকার চেষ্টা করেও শ্রেয়ার গলা ধরে যাচ্ছে, অদিতি বুঝতে পারছিল। শ্রেয়া চলে যাওয়ার পরেও খটকাটা কাটছিল না তার। পাপাই শুধু শুধু মেয়েটির সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করছে ? নিশ্চয়ই মেয়েটির কোনও আচরণে পাপাই আহত ; ছেলে তার এমনিতেই অন্তর্মুখী, হয়তো বাদবিসম্বাদে না গিয়ে নিঃশব্দে সরে আসতে চায় !

সারা দুপুর লেখাতেও মন বসল না অদিতির। কাগজ কলম নাড়াচাড়া করাই সার। বারবার নতমুখী মেয়েটির মুখ মনে পড়ে। শ্রেয়া কেমন মেয়ে ? চেহারা হাবভাবে তো ভাল ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। নিষ্পাপ মুখেও কীট

লুকিয়ে থাকতে পারে। তার ছোট ননদ রিনা তো পাত্রপক্ষের আশীর্বাদের দিন সকালেও তার প্রেমিক অজয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ! বিয়ে যে স্থির হয়ে গেছে সে কথা তখনও অজয়কে বলেনি ! অদিতিকে পথে ধরে অজয়ই একদিন পরে মনোবেদনা জানিয়েছিল। বিয়ের দিন রিনার আপ্লুত মুখ দেখে কেউ বুঝতে পেরেছে টানা দেড় বছর ধরে অজয়কে কড়ে আঙুলে নাচিয়েছে রিনা ? শ্রেয়ার ক্ষেত্রেই বা পাঁচ দশ মিনিট কথা বলে কতটুকু আন্দাজ করতে পারে অদিতি ? সে রাত্রেই বা পাপাই কার সঙ্গে কথা বলছিল ? একই নিবিষ্ট ভঙ্গিতে ? নিচু স্বরে ? হাসি মুখে ?

সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরল সুপ্রতিম। কদিন ধরেই সুপ্রতিমের মুখ শুকনো, আজ যেন আঁধার নেমেছে। কী নিয়ে সুপ্রতিমের উদ্বেগ, জানে অদিতি। জেমসন ইন্ডিয়ার সঙ্গে লোটাস ইন্ডিয়ার সংযুক্তির ব্যাপাবটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সুপ্রতিমদের অফিসে এখন এক জোর গোলমেলে অবস্থা। কিন্তু এত কালো মুখ কেন ? ফিরেই হুড়হুড় করে স্নান করল সুপ্রতিম, চা জলখাবার খেল না, টিভি চালিয়ে বোতল খুলে বসে গেল।

অদিতি পাশে এসে বসে রইল একটুক্ষণ। অফিসের কথা তুললে চটে যাচ্ছে সুপ্রতিম, ও কথা তুলল না। কোমলভাবে বলল, —এই, একটা কথা বলব ?

সুপ্রতিম টিভির দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে না। পর্দাতেই চোখ রেখে বলল, —কী ?

সুপ্রতিম মন খারাপ করে থাকলে অদিতির একটুও ভাল লাগে না। টিপ্পনি কাটবে, গাঁক-গাঁক চেঁচাবে, হো-হো হাসবে, অদিতির ওপর মেজাজ দেখাবে—সেই মানুষটাই তো সুপ্রতিম।

অদিতি সুপ্রতিমের মেজাজটা ছন্দে আনতে চাইল. —চলো না, আজ নাইট শো-এ সিনেমা যাই।

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল সুপ্রতিম, —কেন ?

—অনেক দিন যাইনি তাই।

সুপ্রতিম হুইস্কিতে ছোট্ট চুমুক দিল, —তোমার কি মনে হচ্ছে এটা এখন ফুর্তি করার সময় ?

অদিতি একটু রাগাতে চাইল সুপ্রতিমকে, তাতলে যদি ধাতে ফেরে। বলল, —তোমাকে দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। রোজ যেভাবে এসেই তড়িঘড়ি গ্লাস বোতল নিয়ে বসে পড়ছ।

সুপ্রতিমের চোখ কুঁচকে গেল, —তোমার আপত্তি আছে ?

—অবশ্যই আছে। গত মাসে তোমার প্রেসার কত ছিল মনে আছে ? একশো চল্লিশ বাই নাইন্টি ফাইভ।

—তা হবে। নিজের ব্লাড প্রেসার মুখস্থ রাখা ছাড়াও আমার অন্য কাজ কাছে।

সুপ্রতিমের স্বর বড় নিষ্প্রাণ। অদিতি মিনিট খানেক নীরব থেকে আবার খোঁচাল, —শুধু শুধু খাচ্ছ কেন ? তাতাইকে দিয়ে চানাচুর পোট্যাটো চিপস কিছু আনিয়ে দেব ?

—না। থ্যাঙ্কস।

—খালি পেটে ড্রিঙ্ক করলে তোমার অম্বল হয়। সারা রাত বুক জ্বালা করছে বুক জ্বালা করছে করে ছটফট করবে।

—তোমার অসুবিধে হলে বোলো, সোফায় শুয়ে থাকব।

সুপ্রতিমের বদলে এবার অদিতিই খেপে গেল। বিকেলে ভেবেছিল সুপ্রতিম এলে শ্রেয়ার কথাটা বলবে, বেবাক ভুলে গেল। রাগ রাগ গলায় বলল, —কী এমন আজ ঘটেছে অফিসে, যে বাড়ি এসেও তোলো হাঁড়ি হয়ে বসে আছ ?

হাসিঠাট্টা কোমলতায় যা হয়নি, মেজাজ দেখানোতে তাই হল। ঘড়ঘড়ে গলায় সুপ্রতিম বলল, —হয়ে গেল।

—কী হয়ে গেল ?

—অ্যামালগামেশান। আজ মুম্বাইতে দুই বোর্ডের জয়েন্ট মিটিং ওভার। ডিসিশান ফাইনাল হয়ে গেছে।

—তো কী হয়েছে ? তুমিই তো বলেছিলে অ্যামালগামেশান হলে তোমাদের চাকরির কোনও ক্ষতি হবে না।

—হোয়াট ডু ইউ মিন বাই চাকরির ক্ষতি ? জানো, আজ আমার অফিসে সুইসাইড করতে ইচ্ছে হচ্ছিল ?

—সে কী ! কেন ? অদিতি প্রায় আঁতকে উঠল।

—মিস্টার গিলানি ইজ নো মোর।

—তোমাদের গিলানিসাহেব মারা গেলেন ? স্ট্রোক ?

—দুৎ, মারা যাবেন কেন ! রিজাইন করেছেন। গিলানি আমাকে কী চোখে দেখতেন তুমি জানো না ফুল। অ্যাজ ইফ আই ওয়্যার হিজ সান।

স্বামীর গলায় আদরের ডাকটি শুনে অদিতি দিব্যি বুঝে গেছে নেশার পারা চড়েছে সুপ্রতিমের। তবু বলে ফেলল, —মিস্টার গিলানি তোমার বাপ হতে যাবেন কোন দুঃখে ? তিনি তোমার সমবয়সী না ?

—ওই হল। ওটা কথার মাত্রা। এজ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফাদারহুড। তিনি আমাকে পিতার মতো প্রতিপালন করেছেন, তাই তিনি আমার পিতা। বুঝলে ?

—খুব বুঝেছি। বোতলের ছিপি আটকাল অদিতি, —তুমি খাটবে, কোম্পানির বিজনেস বাড়াবে, কে মাথার ওপর রইল না রইল, তোমার কী দায় ?

মর্মাহত চোখে অদিতির দিকে তাকিয়ে রইল সুপ্রতিম।

অদিতি শাসন করল, —ওঠো। খেয়ে নেবে চলো। তাতাইকেও ডাকছি

খেতে, দয়া করে তাতাইয়ের সামনে আর প্রলাপ বোকো না।

তাতাই টের পেয়েছে সব কিছুই। খাবার টেবিলে বসে হাসছে মিটিমিটি। অদিতি চোখ পাকিয়ে তাকাল ছেলের দিকে। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বলল, চুপ।

পরদিন সম্পূর্ণ অন্য মূর্তিতে অফিস থেকে ফিরল সুপ্রতিম। ক্রোধে গরগর করছে, শূন্যে হাত ছুড়ে আস্ফালন করছে। হেতু কী, না পূর্বভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে গিলানির জায়গায় আসছে কোন এক বিবেক আহুজা। সে নাকি এক বত্রিশ বছরের চ্যাংড়া ছেলে, তারই হুকুমবরদার হয়ে কাজ করতে হবে সুপ্রতিমকে! সব থেকে শোকাবহ ঘটনা বিবেক আহুজা লোটাস ইন্ডিয়ার লোকই নয়, সে জেমসন ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের ভাইপো। নাহ্, এই চাকরি ছেড়েই দেবে সুপ্রতিম। কলকাতার আরও দশটা কোম্পানি সুপ্রতিম মজুমদারকে পাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে।

এমত এক সময়ে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নেমে এল পাপাই। ট্রেন চার ঘণ্টা লেট, কামরায় পাখা জল কিছুই ছিল না, হাক্লান্ত পাপাই সারা দুপুর সারা বিকেল পড়ে পড়ে ঘুমোল।

চিত্ত বিক্ষেপ ঘটলে মানুষ অনেক সাধারণ জিনিসও ভুলে যায়। পাপাইকে দেখেও শ্রেয়ার কথা মনে পড়ল না অদিতির। সে এখন ঘোরতর চিন্তান্বিত। তেইশ বছরের যৌথ জীবনে বহুবারই স্বামীকে অফিস নিয়ে দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হতে দেখেছে অদিতি, এবার যেন বড় বাড়াবাড়ি চলছে। সুপ্রতিম যথেষ্ট হিসেবি মানুষ, সংসারজ্ঞান তার খুবই টনটনে, তার ওপর অদিতির যথেষ্ট আস্থাও আছে, তবু ঝোঁকের মাথায় যদি কিছু করে বসে মানুষটা...! লোটাস ইন্ডিয়া সুপ্রতিমের প্রাণ, প্রায়শই রসিকতা করে বলে কোম্পানি রানস ইন মাই ভেইনস, সেই মানুষ এই পঞ্চাশ বছর বয়সে অন্য কোথাও চাকরি করে কি শান্তি পাবে?

শ্রেয়াব কথা অদিতির মনে পড়ল দিন দুয়েক পর। বিচিত্র এক মুহূর্তে। পাপাই সেদিন সকালে বেরিয়েছিল, ফিরেছে দুটো আড়াইটের সময়, ফিরেই কী সব কাগজপত্র নিয়ে বসে গেছে, অদিতি ছেলের ঘরে এল, —কীরে, ঘড়ির দিকে দেখেছিস? স্নান খাওয়া করবি না?

পাপাই একটা কী ফর্ম ফিল আপ করতে করতে মুখ তুলল, —করব। আগে একটু পোস্ট অফিসে যেতে হবে।

—এক্ষুনি? এই চড়া রোদ্দুরে ফিরলি, আবার বেরোবি? একবারে কাজ সেরে আসতে পারতিস?

মা-র মতো নাবালিকার কথায় বহুদর্শীর মতো হাসল পাপাই, —একবারে সেরে ফেলা গেলে তাই তো করতাম মা। যাও, একটু শরবত নিয়ে এসো।

—তুই কি চাকরির চেষ্টা করছিস?

—না।

—তা হলে কীসের দরখাস্ত পাঠাচ্ছিস ?

—আছে। সময়ে জানবে।

—তুই জি আর ই-তে বসতে চাইছিস, না ? পাস করে স্টেটসে পড়তে যেতে চাস ?

পাপাই চোখের কোণ দিয়ে মার দিকে তাকাল, —গুড গেস।

—তুই বাইরে পড়তে যাবি ? কেন, এখানে কী অসুবিধে ?

—ও মা প্লিজ, আমি যাইনি এখনও অ্যাপ্লাই করছি শুধু। ফট করে ডট পেন বন্ধ করল পাপাই, —বলছি এক গ্লাস শরবত খাওয়াতে। গলা শুকিয়ে গেছে!

ফ্রিজ থেকে স্কোয়াশের বোতল বার করতে করতে শ্রেয়ার কথা মনে পড়ে গেল অদিতির। কেন যে পড়ল! পাপাইয়ের সঙ্গে নিরালায় কথা বলছে বলে কি ? নাকি শেষবার এই স্কোয়াশের বোতল বার হয়েছিল শ্রেয়ার জন্য, সেই কারণে ?

কমলা বর্ণ তরল পাপাইয়ের সামনে রেখে অদিতি কায়দা করে প্রশ্ন করল, —হ্যাঁ রে, যে মেয়েটা রোজ রাত্তিরে তোকে ফোন করে, তার নাম কী রে ?

—কেন বলো তো ?

—না, এমনিই জানতে চাইছিলাম।

—ও।

—মেয়েটা তোর ক্লাশমেট নয়, তাই না ?

—ভালই তো অনুমান করো। পাপাই শরবত শেষ করে ঝটিতি দরখাস্তে মন দিল।

পরবর্তী প্রশ্ন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না অদিতি। শ্রেয়ার সঙ্গে সম্পর্ক কতটা কি না জেনেই মেয়েটির বাড়িতে আসার কথা বলা উচিত হবে ? প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে কত দূর জেরা করা মা-র পক্ষে সঙ্গত ?

অদিতি দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করল, —শ্রেয়াকে চিনিস ?

পাপাই দৃশ্যতই চমকেছে। ডটপেন থেমে গেল, —কে শ্রেয়া ?

—সে তুই আমার থেকে ভাল জানিস।

—আমি কোনও শ্রেয়া-ফেয়াকে চিনি না। পাপাই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, —তুমি কোত্থেকে ওই নাম পেলে ? ও নামে কেউ ফোন করেছিল ?

না, সশরীরে বাড়িতেই এসেছিল। বলতে গিয়েও নিজের জিভকে টেনে রাখল অদিতি। ছেলের মুখ দেখে ব্যাপারটা কি শুধু মান-অভিমান বলে মনে হয় ? কৌশলে সরল সত্যটাকে এড়িয়ে গেল অদিতি। বলল, —মা-র কাছে কি ছেলের কিছু গোপন থাকে রে ? তোর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি...

—স্টপ ইট মা। দম দেওয়া পুতুলের মতো ঘাড় ঘোরালো পাপাই। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে, —তোমাকে কে কী বলেছে জানি না, তবে তুমি আমার মুখ থেকে শুনে রাখো, শ্রেয়া বলে কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার কোনওদিন কোনও

সম্পর্ক ছিল না। এখনও নেই।

—তুই শ্রেয়াকে চিনিস না ?

—চিনব না কেন ? চিনতাম। বাজে মেয়ে। আমার পেছনে খুব লেগেছিল, পাত্তা দিইনি।

ছেলের বিকারহীন মুখভাব দেখে উত্তরোত্তর বিস্ময় বাড়ছিল অদিতির। ফ্যালফ্যাল মুখে বলল, —যে মেয়েটার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলতিস, সে শ্রেয়া নয় ?

—নো।

—তা হলে কে সে ?

—তোমার এত কৌতূহল কেন বলো তো ?

—বারে, ছেলের সম্পর্কে মা-র কৌতূহল থাকবে না ?

—থাকবে। ছেলে যতটুকু বলবে ততটুকুই। কাটো এখন। আমাকে কাজ করতে দাও।

অদিতি আহত মুখে সরে গেল। মনের কোণে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘন হচ্ছে ক্রমশ। পাপাই কি অদিতির কাছ মিথ্যে কথা বলছে ? নাকি শ্রেয়াই... ? মিথ্যে বলে পাপাই বা শ্রেয়া কার কী লাভ ? অদিতি এমন কিছু আদ্যিকালের মা নয় যে পাপাইকে তার কাছে কথা গোপন করতে হবে ! শ্রেয়া কি সত্যিই খারাপ মেয়ে ? সাজিয়ে গুছিয়ে পাপাইয়ের নামে মিথ্যে অভিযোগ জানাতে এসেছিল ? তাই বা কী করে হয় ? মেয়েটা তো ফিরেই যাচ্ছিল, অদিতিই জোর করে... ? শ্রেয়ার আসার কথাটা না বলা কি ভুল হল ?

ভেবে ভেবে কূল পাচ্ছিল না অদিতি। একে সুপ্রতিমকে নিয়ে দুশ্চিন্তা চলছে, সঙ্গে পাপাই মাথায় আর একটা গুবরে পোকা ঢুকিয়ে দিল, অদিতির গল্প লেখা প্রায় লাটে। দুদিন ধরে দুপুরবেলা একটা গল্প নিয়ে কত ঘষাঘষি করল অদিতি, এগোতে পারল না একটুও।

অদিতি যে তিমিরে সেই তিমিরে। স্বামী সন্তান নিয়ে। লেখা নিয়ে। বুঝি বা নিজেকে নিয়েও।

॥ বারো ॥

উদ্বেগেরও প্রাণ আছে, প্রাণীদের মতো তার রূপভেদও অজস্র। কখনও সে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলে। কখনও বা একছিটে মেঘ হয়ে দেখা দেয় মনের আকাশে, ক্রমশ দখল করে নেয় হৃদয়গগন। আবার কখনও বা নিজের ফুঁয়েই নিজে হাওয়া ভরা বেলুনের মতো অতিকায় হয়ে ওঠে।

অফিস নিয়ে সুপ্রতিমের উদ্বেগটা এই বেলুন প্রজাতির। অন্যবারের চেয়ে এবার মাত্রার কিছু তারতম্য থাকতে পারে কিন্তু গুণগত কোনও তফাত নেই।

অচিরেই এক সন্ধ্যায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফিরল সুপ্রতিম। হাতে

প্রকাণ্ড খাবারের প্যাকেট। থরে থরে কেক পেস্ট্রি প্যাটিজ। পার্ক স্ট্রিটের মহার্ঘ দোকান থেকে কেনা।

উল্লাসে টগবগ ফুটছে সুপ্রতিম। দৈবাৎ ঘরে থাকা পাপাই তাতাইকে ডাকছে চেঁচিয়ে, —এই পাপাই, এই তাতাই, আয় আয়। চটপট খেয়ে নে।

অদিতি চোখ বড় বড় করে দেখছিল। লটারি পেয়েছে, না শোকেতাপে পাগল হয়ে গেল মানুষটা ! বলল, —হলটা কী তোমার ? এত কেক পেস্ট্রি তো ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাও খেয়ে শেষ করতে পারবে না !

সুপ্রতিম নিজস্ব সুরে গান ধরেছে, —দিল হ্যায় কি মানতা নেহি..

তাতাই ব্ল্যাক ফরেস্টে কামড় দিয়ে বলল, —বাবা প্লিজ, ওই গানটার সিচুয়েশান আলাদা।

- কী রকম সেটা ?

—ঠিক ফ্যামিলি সিচুয়েশান নয়। একটু নীল আলো... তাতাই ফিক ফিক হাসছে, —তোমার বয়সটাও ধরো আরও পঁচিশ বছর কমাতে হবে.... কোমরটা কমাতে হবে... মাকেও আরও...

অদিতি ধমক লাগাল ছেলেকে, —মহা ডেঁপো হয়েছিস তো ? বাবা মাকে নিয়েও ইয়ার্কি ?

—আরে যেতে দাও। পড়োনি, প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে... সুপ্রতিম হোঁচট খেতে খেতে চাণক্য শ্লোকটা হাতড়াল, —ওই তো বাপ ছেলেতে কী যেন একটা হয় ! কী যেন পুত্রং মিত্রং... ! এই পাপাই, বল না।

পাপাই চিকেন প্যাটিজ চিবোচ্ছিল। উদাস মুখে বলল, —আমাদের স্কুলে স্যানসক্রিট ছিল না বাবা।

—ছিল না ? স্ট্রেঞ্জ ! আমাদের সময়ে তো থাকত। আঃ ল্যাঙ্গুয়েজটা এত সুন্দর ছিল ! ঝনঝন কানে বাজত। এনি ওয়ে, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি ?

—বিলক্ষণ। অদিতি হাত উল্টোল, —কিন্তু বিকজটা কী ?

—আছে। যবনিকা কম্পমান। ধীরে ধীরে উত্তোলিত হবে। বলেই ঘরে ঢুকে গেছে সুপ্রতিম। প্যান্টশার্ট বদলে, মুখ হাত পা ধুয়ে, পাজামা পাঞ্জাবি শোভিত হয়ে বসেছে সোফায়। সিগারেট ধরিয়ে দু পা তুলে দিয়েছে সেন্টার টেবিলে, —আমার অ্যাসেসমেন্টটা ভুল ছিল, বুঝলে ?

—সে আর নতুন কথা কী !

—না না, বুঝছ না, এটা প্রায় ব্লান্ডার হতে যাচ্ছিল। গরম খেয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিলে একেবারে ম্যাসাকার হয়ে যেত।

অদিতি লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, এবারও তা হলে উদ্বেগটা মেঘ ছিল না। এবং বেলুনটা ফেটে গেছে।

অদিতি চোখ নাচাল, —আজ আর তা হলে তোমার গ্লাস বোতল বেরোচ্ছে না ?

—প্রশ্নই ওঠে না। আমি কি ড্রাঙ্কার্ড ? জমিয়ে কফি বানাও তো।

সবিতা তাড়াতাড়ি রান্না সেরে চলে গেছে। অদিতি ছেলেদের জন্য দুধকফি বানাল, নিজেদের জন্য কড়া। কফি নিয়ে সোফায় এসে বসেছে।

যবনিকা উঠতে দেরি হল না। সুপ্রতিম সাড়ম্বরে জানাল কোম্পানি তাকে সব সময়ে ব্যবহারের জন্য গাড়ি দেবে স্থির করেছে, পার্কস-টার্কসও বাড়ছে প্রচুর, বড়সড় পে-হাইক তো হয়েছেই। তবে তার পরিমাণটা নিয়ে ছেলেদের সামনে সে আলোচনা করল না। সুপ্রতিমকে সামনের সপ্তাহে একবার মুম্বাই যেতে হবে, কোম্পানির নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমস্ত ডিপার্টমেন্ট-এর এরিয়া ম্যানেজারদের সঙ্গে বসতে চান।

সুপ্রতিমের এই নাটুকে ভঙ্গিটা অদিতির ভারী প্রিয়। স্বামীর সুসংবাদে সেও খুশি, যেমনটি তার হওয়া উচিত। যতটা উৎফুল্ল হওয়া সুপ্রতিম তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, ঠিক ততটাই উৎফুল্ল সে এখন।

পাপাই বেরিয়ে গেছে। তাতাই ঘরে গিয়ে গান চালিয়েছে। অদিতি আর সুপ্রতিম গল্প করছিল।

অদিতি হাসতে হাসতে বলল, —আমি কিন্তু সত্যিই এতটা আশা করিনি।

—কী ভেবেছিলে ?

—তোমার নাচ দেখে ভাবছিলাম বোধহয় তোমার গিলানিসাহেব আবার ফিরে এসেছেন।

—আরে ছোহ্। ও ব্যাটা চোরস্য চোর। গাঁটকাটা। আমাদের কোম্পানির কত টাকা ঝেড়ে দিয়ে গেছে জানো ? সব ওই বিবেক আহুজা এসে ধরেছে। কোম্পানি তো ভাবছে ওর এগেনস্টে ক্রিমিনাল কেস লজ্ করবে কি না।

অদিতির মুখ অল্প হাঁ, —তুমিই না কদিন আগে গিলানিকে বাবা দেবতা কি সব বলতে !

—আহ্, ও সব এখন দূর অতীত। গিলানি এখন কোম্পানির দুঃস্বপ্ন।

—তোমাদের বিবেক আহুজা তা হলে লোক ভাল ?

—ভাল কী, জেম অব আ ম্যান। আমি জানতাম না, হার্ভার্ড থেকে এমবিএ করেছে। মার্কেট সম্পর্কে কী নলেজ, কী কনসেপশান। কী মডেস্ট বিহেভিয়ার !

—আর সেই গিলানি এখন কোথায় ? টাকাপয়সা নিয়ে ফেরার ?

—ধ্যাৎ, তুমি যে গাঁওয়ার সেই গাঁওয়ারই রয়ে গেলে। অত হাই পোস্টের লোকরা কি এলেবেলে চোরেদের মতো লুকোয় নাকি ? বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখন পিটারসন অ্যান্ড পিটারসনে জয়েন করেছে।

—তারা চোর জোচ্চোর জেনেও নিল ?

—আরে, ওপর মহলে চুরি করার ক্ষমতাটা হচ্ছে এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি। পাপাইটার যেমন হকি, তাতাইয়ের সাঁতার, তোমাদের ওই শিপ্রার মেয়েটার টেবিলটেনিস...। এই ধরো যেমন তোমার গল্প লেখা....। এদের

টাকাপয়সা চুরিটাও ঠিক তেমনি। জুতসই উপমাগুলো দিতে পেরে সুপ্রতিম অট্টহাসি হাসছে। আপন মনে আক্ষেপ উক্তিও করল, —আমি শালা বুরবকই রয়ে গেলাম। কোম্পানির থেকে হাত্তা লুটতে পারলাম না।

অদিতি ভুরু কুঁচকে বলল, —পারলে না কেন?

—ইটস নট মাই ফল্ট। দ্যাট ওল্ড ম্যান, তোমার শ্বশুর, এমন সব জিনিস ছোটবেলা থেকে আমার মাথায় ইনজেক্ট করে দিল! সৎ পথে খেটে খাবি ব্যাটা। মরে গেলেও চুরি জোচ্চুরি করে পকেট ভরাস না, দেখবি পেট আপনি চলে যাবে। যাচ্ছেও তো, যাচ্ছে না?

শ্বশুরমশাই মানুষটাকে কোনওদিনই কট্টর আদর্শবাদী বলে মনে হয়নি অদিতির, বরং একটু যেন ভিতু ধরনের, নির্বিরোধী। একটা অ্যালুমিনিয়াম কারখানার হেড অফিসে মাঝারি অফিসার ছিলেন, বইপত্র পড়ার নেশা ছিল খুব, রাত জেগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনতে যেতেন, কারওরই সাতেপাঁচে থাকতেন না বড় একটা। তিনিও ছেলের মধ্যে একটা সৎ গুণ বপন করে দিয়ে গেছেন ভাবতে ভাল লাগছিল অদিতির। সৎ গুণ, না নিষেধের বেড়ি? অসৎ লোকদের স্ত্রীরা নিজেদের কাছে নিজেরা মুখ দেখায় কী করে? অদিতি হলে তো পারত না।

অদিতি বলল, —চলেই যখন যাচ্ছে, তখন হাহুতাশ করছ কেন?

—না, চারপাশে দেখি তো দিনরাত....

ঝপ করে একটা প্রশ্ন মাথায় এল অদিতির। বলল, —আচ্ছা, তোমাদের গিলানিসাহেব যে চুরি করতেন তা তুমি জানতে?

—সে কে না জানত। বলেই সচকিত হয়েছে সুপ্রতিম। গম্ভীর হয়ে গেল, —বড্ড ফালতু কথা বলো তো। মুড খারাপ করে দিয়ো না।

অদিতি চুপ করে গেল। চুপ নয়, স্থাণু।

আনন্দসন্ধ্যায় ছায়া পড়ছিল। পলকের জন্য সুপ্রতিম বদলে যাচ্ছিল অদিতির চোখে। পলকের জন্যই। সৎ কর্মঠ স্বামীকে নীতিহীন, শিরদাঁড়াবিহীন, চোরের বন্দনাকারী এক অন্তঃসারশূন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল অদিতির।

অদিতি ধমকাল নিজেকে। এতদিন ঘর করার পরে এ-সব ভাবনার কোনও মানে হয়!

সুপ্রতিম টিভি চালিয়েছে। সেন্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেব্‌ল চ্যানেলের সিনেমাটা বার করল। দেখছে। আলগা হাত রাখল বউয়ের কাঁধে, —আজ রাত্রে মেনু কী গো?

—ভাত আর ইলিশ মাছ। অদিতি হাতটা নামিয়ে দিল।

—আম-টাম নেই?

—আছে। খাওয়ার সময়ে কেটে দেব।

—আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। ভাল করে একটা শান্তির ঘুম দরকার।

আজকের কাগজটা একটু এনে দাও তো। চশমাটাও।

কাগজ চশমা দিয়ে ব্যালকনিতে এল অদিতি। টিয়াটাকে ঘরে তুলবে।

পিঠে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে টিয়া। অদিতি কাছে যেতে একবার মুখ তুলেই আবার মুখ গুজল। অদিতির গন্ধও বুঝি আজকাল চিনে গেছে টিয়া, ভয় পায় না। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়।

গেটের সামনে কাদের যেন জটলা চলছে, তিন চারটে ছেলে চেঁচাচ্ছে জোর জোর। স্ট্রিটলাইটটা দপদপ জ্বলছে নিবছে, বড় চোখে লাগে। তারা নেই, আকাশ আবার লাল হয়েছে আজ। বাতাস বইছে। মৃদু, অতি মৃদু, প্রায় না বওয়ারই মতো। রাত্রে আবার ঢালবে নাকি!

টিভির পর্দায় চলমান ছায়াছবি, কাগজের ওপর সুপ্রতিমের ঘুরন্ত পেনসিল, ছেলেদের ঘর থেকে ভেসে আসা পাশ্চাত্ত্য সুর—কেমন অলীক ঠেকছিল অদিতির। সুপ্রতিম আঙুল দিয়ে সেন্টার টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে মাঝে মাঝে, কখনও টিভির গানের তালে ঘাড় দোলাচ্ছে, কখনও বা ছেলের ঘর থেকে ভেসে আসা সুরের তালে। কী আজব যে দেখাচ্ছে দূর থেকে!

সুপ্রতিমের কি নিজস্ব কোনও তাল নেই?

অদিতি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পরদিন তুলতুলি এল। বিকেলের দিকে। ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে। তখন সবে মলিনার মাকে বিদায় করেছে অদিতি, লেখা নিয়ে বসেছে দ্বিতীয় রাউন্ড।

শোওয়ার ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে জিভ কাটল তুলতুলি, —এমা, তুমি লিখছিলে! অসময়ে এসে লেখা চৌপাট করে দিলাম তো!

ঘরের মেঝেতে এলোমেলো কাগজ ছড়ানো, তিনটে বালিশ তিন দিকে ছিটকে আছে, মশলার কৌটো পাউডারের কৌটো অ্যাশট্রেরা পেপারওয়েট হয়ে চেপে রেখেছে কাগজদের। একটা মোটা অভিধানও গড়াচ্ছে মাটিতে, বাংলা।

লেখাতে ছেদ পড়লেও অদিতি বিরক্ত হয়নি একটুও, তুলতুলিকে দেখলে হয়ও না। বরং মনটা এক নির্মল প্রসন্নতায় ভরে যায়। বাপের বাড়ির সৌরভ বয়ে নিয়ে আসে বলেই কি? হবে হয়তো।

অদিতি বলল, —ছাড় তো আমার লেখা। এ হল অন্ধ মানুষের সেলাইফোঁড়াই নিয়ে বসা, স্রেফ সময় কাটানো।

—সে তুমি যাই বলো পিসি, লেখাটাও তো একটা কাজ। তিন চারটে গল্প ছাপা হয়ে গেল, তুমি এখন পুরোদস্তুর লেখক ছাড়া আর কী!

অদিতির মনটা থইথই করে উঠল। বাড়ির লোকে না পুছুক, ভাইঝি তাকে লেখক বলে মানে! মানে দাদাও, যদিও সে পড়েনি কিছুই।

অদিতি মধুর হেসে বলল, —তুই কিন্তু অনেক দিন পর এলি তুলতুলি।

—ইউনিভার্সিটি না থাকলে আসা হয় না গো।

—কবে খুলল ?

—তা হল গিয়ে ধরো আট দিন। রোজই ভাবি ফেরার পথে নামব, আকাশ দেখে সাহস হয় না। কাল রাত্রে বাবা খুব খ্যাচখ্যাচ করছিল, তাই আজ জয় মা বলে...

মুহূর্তের জন্য অলকেশের মুখটা দেখতে পেল অদিতি। মলিন বিষণ্ণ এক দাদা বোনের মাথায় খুশির জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছে ধীর পায়ে অবসন্নের মতো।

অদিতি লজ্জিত মুখে বলল, —আজ আমার লেখাগুলো দিয়ে দেব, নিয়ে যাস তো। দাদাকে পড়তে দিস। সেদিন অমন ভরা বর্ষায় এল... যাওয়ার সময় আমারও মনে পড়ল না...

—বাবা এসেছিল নাকি ? কবে ?

—এই তো দিন পনেরো আগে। কেন, তোদের বলেনি ?

—না তো !

অদিতি আর বেশি কিছু বলল না। কাগজপত্র গোছ করে রেখে তুলতুলিকে শোওয়ার ঘরে বসাল। ফ্রিজে কালকের পেস্ট্রির পাহাড় পড়ে আছে, ভাইঝির জন্য নিয়ে এল দুটো। তুলতুলিকে দেখার পর থেকেই একটা প্রশ্ন মাকুর মতো বুকে ঘুরে চলেছে। দোনামোনা করে বলেই ফেলল, —তুই আমাকে একটা খবর এনে দিতে পারবি ?

—কী খবর ?

—একটা মেয়ের সম্পর্কে। তোদের যাদবপুরেই পড়ে। ইংলিশে অনার্স।

—কোন ইয়ার ? কী নাম ?

—ইয়ার বলতে পারব না। নাম শ্রেয়া। টাইটেলটাও ঠিক জানি না।

চামচেতে পেসট্রি কেটেও মুখে পুরছে না তুলতুলি। হাত স্থির, চোখ অদিতির চোখে।

—তুমি কী জানতে চাও ?

—তুই মেয়েটিকে চিনিস ?

—আগে তুমি কী জানতে চাও বলবে তো ?

—তেমন কিছু নয়। এই... মেয়েটি কেমন... মানে...

—কেন বলো তো ?

তুলতুলির দৃষ্টি বড় অন্তর্ভেদী। অদিতির অস্বস্তি হচ্ছিল। সঙ্কোচও। পাপাই তার এত ভাল ছেলে, তাকে সে কি বিশ্বাস করে না ? সংশয় যে তবু যায় না মন থেকে !

দ্বিধা ঝেড়ে অদিতি বলেই ফেলল তুলতুলিকে। সব কথা। শ্রেয়ার আসা থেকে শুরু করে পাপাইয়ের উত্তর। সব। শুনে তুলতুলির মতো প্রাণচঞ্চল মেয়েও চিত্রার্পিতের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ।

মাথার ওপর বনবন পাখা ঘুরছে। ছিরছিরে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। তবু যেন গুমোটে গায়ে জ্বালা ধরে। মাঝবিকেলেই আলো কমে এসেছে খুব। বাঁকে পৌঁছে হুইসিল দিচ্ছে ইলেকট্রিক ট্রেন, লেভেল ক্রসিং-এর গেট পড়েনি বোধহয়।

তুলতুলি প্লেটটা রান্নাঘরের সিঙ্কে রেখে এল। মাখন-রঙ দোপাট্টার কোণ দিয়ে আলগা মুছছে মুখ। নিচু গলায় বলল, ––আমি মেয়েটাকে চিনি পিসি। ইন ফ্যাক্ট চিনতাম না, পাপাইয়ের সঙ্গে আমাদের ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করতে দেখে যেচেই আলাপ করেছিলাম। শ্রেয়া খুব ভাল মেয়ে পিসি। যেমন লেখাপড়ায়, তেমন স্বভাবচরিত্রে। শান্ত। কুল।

অদিতি ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। ঢোক গিলে বলল, —তা হলে হয়তো ওদের কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে ! লজ্জায় দুজনেই বলতে চাইছে না !

তুলতুলি বিছানায় বসল। একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল, —পাপাইকে দেখে আমরা যেরকম ভাবি পাপাই ঠিক সেরকম নয় পিসি। আমারও ধারণা ছিল পাপাই শুধু অ্যাকাডেমিক মাইন্ডের ছেলে, চারদিকের কিছু বোঝে না, জানে না, খেয়াল করে না... তুলতুলি একটা বড় করে নিশ্বাস নিল, —আমারই ভাই, বলতে খারাপ লাগে, শ্রেয়া ছাড়াও আরও দু-তিনটে মেয়ের সঙ্গে ওর একইরকম সম্পর্ক আছে।

অদিতির চোখে অবিশ্বাস, —তুই কী করে জানলি ?

—জেনেছি। শ্রেয়াও বলেছে। পাপাইকে জিজ্ঞেস কোরো নন্দিনী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরত কিনা ! তারপর দেবাঞ্জলি ! তারপরেও একটা মেয়ে, সে অবশ্য আমাদের যাদবপুরের স্টুডেন্ট নয়, বোধহয় গোলপার্ক-টোলপার্কের দিকে থাকে...। গরমের ছুটির পর শ্রেয়া আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করছিল একদিন। পাপাইয়ের ব্যাপারে মেয়েটা ভীষণ সিরিয়াস গো। আমি ঠিক করেছিলাম পাপাইয়ের সঙ্গে নিজেই কথা বলব। এর মাঝে যে এত কিছু ঘটে গেছে... শ্রেয়া এখানে এসেছে...। পাপাই কিন্তু ভাল কাজ করছে না পিসি।

তুলতুলি কথা বলছে না, যেন এক অদৃশ্য হাত সপাসপ চড় মারছে অদিতিকে। এই সেদিনের পাপাই, মা ভাত খাইয়ে না দিলে খেতে পারত না, তাতাই হওয়ার পর মা-র কোল না পেয়ে মা-র একটা শাড়ির কোনা মুঠোয় চেপে সারারাত ঘুমোত—সেই পাপাই মেয়েদের নিয়ে খেলা করতে শিখে গেছে! অদিতির বড় দর্প ছিল তার ছেলেরা শুধু লেখাপড়াতেই ভাল হয়নি, তাদের চরিত্রও দৃঢ়ভাবে গড়ে দিতে পেরেছে অদিতি, এই তার নমুনা !

রাগটাকে দলামোচড়া কাগজের মতো পাকিয়ে রাখল অদিতি, রাত্তিরে খেতে বসে সকলের সামনে ফাঁস করল কথাটা। ইচ্ছে করেই। সুকৌশলে।

পাপাইয়ের বাঁ হাতে ইংরিজি থ্রিলার, খেতে খেতে পড়ছে পাপাই। টিভি খোলা, হরর্ মুভি চলছে, দূর থেকেও তাতাইয়ের চোখ সেঁটে আছে পর্দায়।

সুপ্রতিম, তৃপ্ত সুখী সুপ্রতিম, জরিপ করছে কাটা আমের টুকরো, স্যালাডের প্লেট।

অদিতি অনেক দূর থেকে প্রসঙ্গে এল। পাপাইয়ের পাতে রুটি দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল, —হ্যাঁ রে পাপাই, তুই যে জি আর ই দিচ্ছিস, বাবা জানে ?

পাপাই বই থেকে চোখ সরাল না, —হুঁ।

—ও, বাবাকেও বলা হয়ে গেছে ? আমার বেলাই যত লুকোছাপা ?

—বাবাকে তো বলতেই হয়। আফটার অল পরীক্ষার ফি-টা তো বাবাকেই দিতে হবে।

—কত ?

—হাজার তিনেক।

—পাশ করলে কী করবি ?

—বাইরে পড়তে যাব।

—কেন, এখানে এম এসসি পি এইচ ডি করা যায় না ?

—যায়। কিন্তু লাভ কী ?

—মানে ?

—এখানে রিসার্চের স্কোপ অনেক কম। ওখানে কত অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরি, শয়ে শয়ে জার্নাল, দুর্দান্ত গাইড... পড়াশুনোর পরিবেশই কত ভাল। এক একটা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কী বিশাল বিশাল লাইব্রেরি আছে কল্পনাও করতে পারবে না।

—শুধু তোর পড়ার মগজটা এখান থেকে তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছিস, তাই তো ?

বইয়ের পাতা আঙুলে মুড়ে অদিতির দিকে তাকাল পাপাই। বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, —সরি। বুঝলাম না।

অদিতি শান্ত মুখে বলল, —এ কথা তুই বুঝিস না তা তো নয় পাপাই। ওখানকার সবই ভাল। মানছি। কিন্তু ওখানে পৌঁছনোর জন্য এখানকারই সব অযোগ্য অচল অখদ্যে জায়গাগুলো থেকে বেস তৈরি করে নিয়ে যেতে হয়, তাই না ?

পাপাই কাঁধ ঝাঁকাল, —কী করব, এমন দেশে জন্মেছি...

সুপ্রতিম কথা শুনছে মা ছেলের। হাসছে। মজা পাচ্ছে।

অদিতি বলল, —সেই জন্মস্থানে ফিরবি তো পাপাই ?

—এখনই এসব কথা বলছ কেন বলো তো মা ? আগে চান্সটা তো পাই...

—ধর পেলি। কী করবি ?

—এটা একটা হাইপথিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয়ে গেল মা।

—তবু তোর মনে তো কিছু একটা ভাবনা আছে...

—তোমার কি মনে হয় ? ফেরা উচিত ?

—আমার কথা বাদ দে। তুই বল।

দু-এক পলক ভাবল পাপাই। তারপর বলল, —আচ্ছা তুমিই বলো, এখানে ফিরে কী লাভ ? ধরো ওখানে যদি ভাল একটা জায়গায় রিসার্চ করার সুযোগ পাই, এখানে চলে এলে তা কি কন্টিনিউ করতে পারব ? আমার ন্যাক স্পেস সায়েন্সে, অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সে। মহাকাশ। এখানে তার স্কোপ কোথায় ? নাসার মতো জায়গার কথা বাদই দাও, একটা ভাল অবজারভেটরি আছে ইন্ডিয়ায় ? বলতে বলতে বাবা আর ভাইকে একঝলক দেখে নিল পাপাই, —এখানে ফেরা মানে আইদার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ঠেঙানো, নয়তো মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে রাতদিন ঘচর-ঘচর করা। উইদাউট এনি সিরিয়াস গেইন।

তাতাই হি-হি হেসে উঠল। আসল কথাটা চেপে যাচ্ছিস কেন রে দাদা ? বল না ওদেশে মাল্লু বেশি। রাজার হালে থাকবি...

ভুরু কুঁচকে ভাইকে দেখল পাপাই। বলল, —হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ। ওখানে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য। এখানকার মতো হুকার ভিড় বস্তি পলিউশন... একটা কাম কোয়ায়েট লাইফ কে না চায় !

তাতাই বলল, —আমার বাবা নোংরা দেশই ভাল। খামচে খুমচে ঠিক টাকা রোজগার করে নেব। এত চারদিকে দুশো পাঁচশো হাজার কোটি টাকা গলে যাচ্ছে, কোথাও থেকে খাবলা মারতে পারব না ?

অদিতি বলল, —তার মানে টাকা রোজগারই তোদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই তো ?

সুপ্রতিম এতক্ষণে মুখ খুলেছে। প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে বলল, —চোখ কান খোলা মানুষ হলে তাই তো হওয়া উচিত। আমি তেমন কামাতে পারিনি কোনওদিন, তা বলে আমার ছেলেরাও পারবে না ?

এই মুহূর্তে এই ঘরে নিজেকে ভিন্ন গ্রহের মানুষ মনে হচ্ছিল অদিতির। ছেলেদের পিছনে যে এত পরিশ্রম করেছে, এত সময় দিয়েছে, তার ফল তা হলে এই ? এক বৃহৎ অশ্বডিম্ব ?

অদিতি শুকনো স্বরে বলল, —তা হলে বলো, ওদেশে গবেষণা করতে যাচ্ছি বলাটা একটা অজুহাত। বলো সুখ কিনতে যাচ্ছে তোমার ছেলে।

সুপ্রতিম কী যেন বলতে যাচ্ছিল, পাপাই হাতের ইশারায় থামাল, —তোমার কি ধারণা মা ওদেশে সুখ এমনি এমনি মেলে ? রিসার্চ করে, খেটে আমি যদি কোনও সার্ভিসই না দিতে পারি, ওরা মুখ দেখে আমাকে গাড়ি বাড়ি দেবে ?

—সে তুই ওদের দেশকে সার্ভিস দিবি, তাতে আমাদের কী ?

—বিজ্ঞানের এ-দেশ ও-দেশ নেই মা। নিউটনের আবিষ্কার কি শুধু নিউটনের দেশে কাজে লেগেছে ?

—নিউটন তো আর গরিব দেশের মানুষ হয়ে জন্মে বড়লোকের দেশে মগজ বিক্রি করতে যায়নি !

পাপাই মুখ টিপে হাসল, —যদি সত্যি আমার মগজ বিক্রি হয়, তুমি কিন্তু তার শেয়ার পাবে মা। ডলারে।

অদিতি পাপাইয়ের কপটতার সীমা দেখবে আজ। মনের কষ্ট মনে চেপে বলল, —বাপ মা নয় বুড়ো বয়সে তোর পাঠানো ডলার চিবিয়ে সুখী হল, ওদেশে সেটল্ করলে তোর আমাদের জন্য মন কেমন করবে না ?

সুপ্রতিম ফস করে বলে উঠল, —তুমি আজ আমার বড় ছেলেটাকে নিয়ে পড়লে কেন বলো তো ? বেচারা একটা ব্রাইট ফিউচারের জন্য চেষ্টা করছে, কোথায় এনকারেজ করবে...

—ডিসকারেজ তো করিনি। আমি বোকাসোকা মানুষ, শুধু বুঝতে চাইছি। অদিতির ঠোঁটে বিদ্যুৎ, —এইটুকু বুঝতে পারি, ও নাসায় বসে চাঁদে রকেট পাঠালে আমাদের মলিনার মা-র উপকার হবে না। যতই যা হোক, ওর এখানকার স্কুল কলেজের খরচায় মলিনার মা-র তো পাঁচটা পয়সাও আছে। কিরে তাতাই, তোদের ইকনমিকস্ বই কী বলে ?

দাদাকে জাঁতাকলে পড়তে দেখে তাতাই খুব খুশি। বলল, —হ্যাঁ, লেখাপড়াতে তো স্টেট কম সাবসিডি দেয় না, সেখানে তো মলিনার মারও কনট্রিবিউশান আছে।

অদিতি বলল, —মরুক গে যাক মলিনার মা। আমার কথাটার উত্তর দে পাপাই, বাবা মা-র জন্য মন কেমন করবে ?

পাপাইয়ের স্থৈর্যে চিড় ধরেছে যেন। বিরক্ত মুখে বলল, —তোমার হাইপথিটিকাল কোয়েশ্চেন ইজ গোয়িং টুউ ফার মা। অতই যখন বোঝো, তখন এটাও নিশ্চয়ই জানো, পৃথিবী এখন একটা বিশাল গ্রাম। তোমরা এক পাড়ায় থাকবে, আমি থাকব আর এক পাড়ায়। ইচ্ছে হলে আমরা এ পাড়া ও পাড়ায় যাওয়া আসা করব। বাবা মা দেশে পড়ে রইল... মন কেমন করা... এ-সব মধ্যযুগীয় সেন্টিমেন্ট আর চলে না মা। তুমি কি চাও শুধু তোমাদের বুড়ো বয়সে দেখভাল করার জন্য, টু বি মোর প্রিসাইজ, তোমার ছেলে শুধু তার মুখখানা তোমাদের দেখানোর জন্য, নিজের ভূত ভবিষ্যৎ নষ্ট করে পচে মরুক ? এটা কি একটা সুস্থ চিন্তা ?

এই তো ছেলেকে চিনতে পারছে অদিতি। মুখোশটা সরে যাচ্ছে। শীতল হৃদয়হীন এক রোবট সামনে এখন।

রোবটের শক্তি পরখ করা দরকার। অদিতি অতর্কিতে আঘাত হানল, তুই বল কোনটা সুস্থ চিন্তা রে পাপাই ? বিদেশে পালাবি প্ল্যান করে রেখেছিস বলে এখানে একটার পর একটা মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াবি, এটাও কি সুস্থ চিন্তা ? নাকি একটা নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়েকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলার জন্য বাজে মেয়ের বদনাম দেওয়াটা সুস্থ চিন্তা ?

টেবিলে যেন বাজ পড়ল। পাপাই পাথর। তাতাইয়ের হতচকিত চোখ ঘুরছে সকলের মুখের দিকে। সুপ্রতিমের হাত থেকে আমের আঁটি পিছলে গেল, মোজাইক মেঝেতে গড়াচ্ছে।

অদিতি ধারালো দৃষ্টিতে পাপাইকে দেখছে, —চুপ মেরে গেলি যে ? বল কী

মহৎ ধারণা থেকে তোর দেবাঞ্জলি, নন্দিনী, শ্রেয়া, তারপর ওই গোলপার্কের মেয়েটা....

—মা। পাপাই উঠে দাঁড়িয়েছে, —তুমি কিন্তু লিমিট ক্রশ করে যাচ্ছ।

—লিমিট কে ক্রশ করছে ? তুই, না আমি ? বল আমি একটাও বাজে কথা বলছি ? ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে তুই বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছিস না ?

—আমি যা করছি সেটা আমার ব্যাপার। তুমি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন ?

—গলাচ্ছি, কারণ আমি তোমার মা।

—তো ?

রাগে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছিল না অদিতির। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। হেঁটমাথা হয়ে বসে আছে।

পাপাই দুম-দুম করে ঘরে ঢুকে গেল। তাতাইও মানে মানে সরে পড়েছে। সুপ্রতিম এখনও চুপ।

বৃষ্টি পড়ছিল। মুষল ধারে, বড় বড় দানায়। জলের ঝাপটায় ভেসে যাচ্ছে ব্যালকনি। টিয়া অস্থির নড়াচড়া করছে খাঁচায়।

সুপ্রতিম এঁটো হাতেই বসে আছে। ফিসফিস করে বলল, —কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করলে না।

অদিতি মুখ তুলল।

—বোঝো না কেন, ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। ওদের একটা পারসোনাল লাইফ তৈরি হয়েছে, সেখানে কি ওরা আর আমাদের খবরদারি মেনে নেবে ?

অদিতি নাক টানল, —তুমি পাপাইকে সাপোর্ট করো ?

—সাপোর্ট-টাপোর্ট করার কথা হচ্ছে না। ওরা ওদের মতো থাক, আমরা আমাদের মতো থাকব। ছেলেরা বড় হয়ে গেলে এ-ভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয়।

—ছেলে চোখের সামনে অন্যায় করছে দেখলেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকব ?

—থাকবে। তুমিই তো সেদিন আমাকে বললে, কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করা উচিত নয় ?

বিমূঢ় চোখে তাকাল অদিতি, —সে তো দীপক শর্মিলার ব্যাপারে। তারা তো বাইরের লোক ! ডিভোর্স একটা প্রাইভেট ব্যাপার।

—এটাও তোমার ছেলের প্রাইভেট ব্যাপার। দীপক শর্মিলা অ্যাডাল্ট, তোমার ছেলেও অ্যাডাল্ট, সেই মেয়েগুলোও কেউ কচি খুকি নয়। একটাতে নাক গলানো অন্যায় হলে, অন্যটাও অন্যায়। তাদের ব্যাপার তারা বুঝবে, হু দা হেল ইউ আর ? সুপ্রতিম সেকেন্ডের জন্য থেমে বলল, —তাদের কেউ যদি এখানে মায়াকান্না কাঁদতে আসে, কান ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। গল্প লিখছ, গল্প লেখা নিয়ে থাকো, তা নয় যত সব...। আমার অত মেরিটোরিয়াস ছেলে..। না না, কাজটা ভাল করোনি অদিতি।

বৃষ্টির হুঙ্কার বাড়ছে। ধোঁয়া ধোঁয়া জলকণা মথিত করছে ত্রিভুবন। রুপোলি তলোয়ার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে আকাশ।

অদিতি কাঁদছিল। কিন্তু কার জন্যে!

॥ তেরো ॥

হেমেন ফ্ল্যাটে ঢুকেই হেঁকে উঠলেন, কই, অদিতি কোথায়? শিগ্‌গির মিষ্টি নিয়ে এসো।

হেমেনের পিছনে রঞ্জন, তার স্বরে মার্জিত উল্লাস, —শুধু মিষ্টিতে হবে না হেমেনদা, আমাদের একদিন পেট পুরে মাংসভাত চাই।

সোফায় আংটা লাগানো রঙিন পর্দার স্তূপ। টাঙাচ্ছিল অদিতি, তাতাইকে সঙ্গে নিয়ে। প্রতি বছরই পুজোয় অদিতির ফ্ল্যাটে নতুন পর্দা ঝোলে, এ বছর সেলাই করাতে করাতে দেওয়ালি ভাইফোঁটা পার হয়ে গেল।

চটপট পর্দাগুলো শোওয়ার ঘরে রেখে এল অদিতি। হাসিমুখে বলল, —খাওয়াতে হবে তো বুঝলাম, কিন্তু উপলক্ষটা কী?

—তুমি আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দ্যাখো নি?

—কীসের বিজ্ঞাপন?

—ও হো, সরি। তোমার বাড়িতে তো আবার রোববার ছাড়া বাংলা কাগজ ঢোকে না।

—ও হেমেন মামা, হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলুন না।

হেমেনের আগে রঞ্জনই বলল, —আজ বিজ্ঞাপনে আপনার নাম বেরিয়েছে। আগামী কাল রবিবারের পাতায় আপনার গল্প থাকবে।

হৃৎপিণ্ড চলকে উঠল অদিতির, শিরা-উপশিরায় রক্তচাপ বেড়ে গেছে সহসা। যা শুনছে তা কি সত্যি?

মনের উচ্ছ্বাস যাতে ছেলেমানুষি মনে না হয় তার জন্য সতর্ক হল অদিতি। কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, —এ কিন্তু সবটাই হেমেন মামার কৃতিত্ব।

—কেন? গল্পটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে? আমি তো শুধু ক্যুরিয়ারের কাজ করেছি।

—আপনি না নিয়ে গেলে...আপনার কত জানাশোনা...

—আহ্ অদিতি, এ-সব কী কথা! তোমার গল্প তার নিজের মেরিটেই বেরোচ্ছে। আমি কাউকে কিচ্ছু বলিনি। নিজের লেখা নিয়ে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকা একদম ভাল নয়।

রঞ্জন বলল, —আমি প্রথম গল্পটা পড়েই বুঝেছিলাম আপনার মধ্যে ফ্ল্যাশ আছে। এখন আপনার দরকার শুধু অধ্যবসায়, পড়াশুনো, আর অবিরাম লিখে লিখে লেখা আরও শানানো।

তাতাই সোফায় বসে কথা শুনছে সকলের। বাইরের মায়াবী হেমন্তের

বিকেল অনেকক্ষণ ধরেই টানছে তাকে, পর্দা টাঙানোর মতো নগণ্য কাজে মাকে সাহায্য করতে গিয়ে ইঁদুরকলে আটকে পড়েছিল সে, অতিথিদের আগমনে তার নিমপাতা খাওয়া মুখ বেশ প্রফুল্ল এখন। চনমনে গলায় জিজ্ঞাসা করল, —খবরের কাগজে গল্প লিখলে টাকা পাওয়া যায় না ?

—সে তো যায়ই। মজলিশি ভঙ্গিতে বসেছেন হেমেন, —কমার্শিয়াল কাগজ লেখা ছাপবে, সম্মানমূল্য দেবে না ?

—মা-ও পাবে ?

—অবশ্যই।

তাতাইয়ের কৌতূহল বাড়ছে। একবার মাকে দেখল, একবার অন্য দুজনকে। বলল,— কত দেবে ?

—তা ধরো পাঁচ-ছশো তো দেবেই। বেশিও দিতে পারে।

—ওয়াও ! পাঁচ-ছশো ! মা, এটা তোমার জীবনের প্রথম কামাই, তাই না ?

অদিতি মুখ টিপে হাসল।

—পয়লা কামাই কিন্তু ব্যাগে পুরতে নেই মা, পুরোটাই খরচ করতে হয়।

অদিতির হাসি অম্লান।

তাতাই উঠে পড়ল, —আমার কিন্তু চাইনিজ বুক করা রইল মা।

তাতাই চলে যাওয়ার পর গল্পগুজব জমে উঠেছে। হেমেন এসেছেন দিন কুড়ি পর। শেষ যেদিন এসেছিলেন সেদিন অদিতির বাড়ি ভর্তি লোকজন। পার্থ কাবেরী বাবাই তো ছিলই, সঙ্গে সুপ্রতিমের দুই বোন ভগ্নিপতি আর তাদের ছেলেমেয়েরাও। পার্থ লখনউ ফিরে যাওয়ার আগে সেদিনই ছিল ভাইবোনদের শেষ মিলনদিবস। হেমেনমামার সঙ্গে অদিতি ভাল করে কথাই বলতে পারেনি সেদিন।

আজ হেমেন গল্পের মেজাজে আছেন। বহু প্রবীণ লেখকের জীবনের অজস্র অকথিত ঘটনা হেমেনের মুখস্থ, হেমেন রসিয়ে রসিয়ে চুটকির মতো শোনাচ্ছেন সে-সব। মাঝে মাঝে হেমেন আর রঞ্জনের তর্কও হচ্ছে জোর। সাহিত্যে পরাবাস্তবতা জাদুবাস্তবতা, মিথ ফ্যান্টাসির সঙ্গে বাস্তবের কোথায় মিল, কোথায় বা গরমিল, লেখার বিষয় ও আঙ্গিকের দ্বন্দ্ব, কত কী যে তর্কের বিষয়।

রঞ্জন যখন যাব যাব করছে, অদিতি জিজ্ঞাসা করল, —আবার আসছেন কবে ?

রঞ্জন বলল, —দেখি। চলে আসব যে কোনওদিন।

অদিতি বলল —এ কথা আপনি আগের দিনও বলেছিলেন, এলেন তিন মাস পরে।

হেমেন বললেন, —আসবেটা কী করে ? ওর পুজোর লেখা ছিল না ? পুজোয় কী কী লিখলে রঞ্জন ?

রঞ্জন সলজ্জ মুখে বলল, —গোটা কয়েক গল্প, একটা উপন্যাস, আর একটা

হালকা প্রবন্ধ।

অদিতির চোখ বড় বড় হয়ে গেল, —এত লিখেছেন ?

হেমেন বললেন, —উঠতি লেখকদের কাছে পুজো সংখ্যায় লেখা যে কী নেশার তা তুমি বুঝবে না অদিতি। এই একটা পত্রিকায় লিখছে, ওই একটা পত্রিকায় লিখছে। আমি নয় বার করিনি, কিন্তু কত পত্রিকা যে বার হয় এ সময়ে...

রঞ্জন বলল, —এ আর আপনাকে বলে বোঝাতে হবে না হেমেনদা, দু-এক বছর লেখার জগতে থাকলে উনি নিজেই বুঝে যাবেন। তখন পুজোর আগে কে বাড়িতে এল কে এল না তা মনেই থাকবে না। সুরার নেশা মানুষ ত্যাগ করতে পারে, সাহিত্যের আকর্ষণ ত্যাগ করা বড় কঠিন।

হেমেন ঘন ঘন ঘাড় দোলাচ্ছেন, —তা বটে ! তা বটে ! আচ্ছা অদিতি, এবার তো একদিন আমরা তোমার এখানেই বসতে পারি !

—আমার এখানে ! খুব ভাল হয় তা হলে। কবে আসবেন বলুন ? কে কে আসবেন ?

—সে অনেক লোক হয়ে যাবে। রঞ্জন, তোমাদের ওখান থেকেও কয়েক জনকে আসতে বলো না। আনিসুরকেও এনো।

—শেয়ালদের ভাঙা বেড়া দেখাচ্ছেন ? রঞ্জন অদিতির দিকে তাকিয়ে হাসছে,—এ লাইনে কম পাগল আছে ! একবার গ্রিন্ সিগনাল দিলেই দেখবেন আপনার ফ্ল্যাট প্যাকড্ হয়ে গেছে।

—ভালই তো। ফ্ল্যাটটা তাও পাগলদের কাজে লাগবে।

হেমেন জিজ্ঞাসা করলেন, —কবে তা হলে বসছি আমরা ?

অদিতি বলল, —আপনিই বলুন। কাল রবিবারের পরের রবিবারে আসবেন ?

—তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো ?

—একটুও না।

খুশিতে ঝলমল করছিল অদিতি। হৃদয়ের গভীরে, অনেক গভীরে, এক ঝর্না বয়ে চলেছে কুলকুল। পাথর ভাঙছে। অসংখ্য নুড়ি সরে সরে গিয়ে পথ খুলে দিচ্ছে ঝর্নার। নিস্তরঙ্গ খাতে বইতে থাকা জীবন আবার যেন ছোঁয়া পেল প্রাণের।

সুপ্রতিম ফিরল একটু রাত করে। মুম্বাই থেকে কোম্পানির কিছু কেষ্টবিষ্টু এসেছে, তাদের সঙ্গে সেলস্ প্রোমোশন নিয়ে অফিসে মিটিং চলেছে বহুক্ষণ, তারপর ক্লাবে বসেছিল সবাই। আহারাদি সেরে এসেছে সুপ্রতিম, মদ্যপানও ভালই করেছে, মেজাজ দিব্যি আমোদিত হয়ে আছে তার। ফিরেই শুরু হয়েছে অফিসের কথা, —জানো আজ ভোগলে কী বলেছে আমাকে ? বলেছে মজুমদার ইউ আর জিনিয়াস্। বলো তো কেন বলেছে ?

গল্প বেরোনোর খবরটা সুপ্রতিমকে দেওয়ার জন্য ছটফট করছিল অদিতি।

পাপাই তাতাই খেতে বসেছে, তাদের আয়োজন সাজিয়ে অদিতি ড্রয়িং স্পেসে এল। নিজের উৎসাহ চেপে প্রশ্ন করল, —কেন ?

সোফায় অদিতির পাশে ধুপ করে বসল সুপ্রতিম, —আমাদের কোনও জোন্ই এবার হাফইয়ারলি টার্গেট রিচ করতে পারেনি, একসক্লুডিং দিস্ মজুমদারস্ জোন্। নট ওনলি টার্গেট, আমাদের নতুন শ্যাম্পু বিল্কি সব জায়গায় ফ্লপ, এক্সেপ্ট্ দিস্ ইস্টার্ন এরিয়া। আরে বাবা, রঙ্গনাথের খেলা কি চিরকাল চলে ? জানো তো ব্যাটা কী করেছিল ?

অদিতি না শুনে বলল, —আমার একটা দারুণ খবর আছে।

—তোমার ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমার।

—কী খবর ?

—ওই যে হেমেনমামা আমার একটা গল্প নিয়ে গিয়েছিল, সেটা কালকের কাগজে বেরোচ্ছে।

—অ। তাই বলো। আমি ভাবলাম কি না কি ! এমনভাবে বললে...

—বারে, এটা বড় খবর নয় ?

সুপ্রতিম ঢুলু-ঢুলু চোখে হাসল, —তোমার বলার ধরন দেখে কী মনে হচ্ছিল জানো ?

—কী ?

আহাররত ছেলেদের এক ঝলক দেখে নিয়ে ফিস ফিস করে সুপ্রতিম বলল, —ভাবলাম বুঝি পাপাই তাতাইয়ের পরে আবার কেউ আসছে।

—শুধু ইয়ার্কি। অদিতি হেসে ফেলল, —তোমার এটাকে দারুণ খবর বলে মনে হয় না ?

—ভালই তো। গুড নিউজ। তোমার উন্নতি হচ্ছে। তবে এর জন্য তোমার আমাকে ক্রেডিট দেওয়া উচিত।

—কেন ?

—তোমার কি ধারণা তোমার হেমেনমামাই তোমাকে একা উৎসাহ দিয়েছে ? আমি দিইনি ? আমি তোমাকে বলিনি দুপুরগুলো নষ্ট না করে লেখো ? বলিনি ঝুটঝামেলায় জড়ানো বা শুয়ে-বসে সময় কাটানোর থেকে লেখা অনেক ভাল কাজ ?

অদিতি দূরমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল, —তা তো বটেই।

—গুড। মাথায় রেখো কথাটা। জুতো খুলে মোজা দুটো জুতোর ভেতর চালান করল সুপ্রতিম, —হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কী বলছিলাম যেন ?

—কী বলছিলে ?

সুপ্রতিম এক সেকেন্ড মাথা চুলকোল, —হ্যাঁ, সেই রঙ্গনাথন। সে কী করেছিল জানো ? আন্ইম্যাজিনেবল্ থিং। রেল কোম্পানিকে ধরে বেয়াল্লিশ লাখ টাকার ডিটারজেন্ট্ বেচে দিল। কী করে করল বলো তো ?

অদিতি উদাস গলায় বলল, —কী করে ?

—ক্যাচ্ ছিল। রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার ব্যাটার মামাশ্বশুর। হি ইজ দা কিই। নইলে ভাবতে পারো রেল ডিটারজেন্ট কিনছে! আমাদের পারচেজের মুখার্জি তো শুনে বলেছিল, মজুমদারদা আপনার ছেলেদের ধরে ধরে ধাপার মাঠে পাঠিয়ে দিন! পারফিউম বেচে আসবে! হা হা কী জোক! সেই রঙ্গনাথনের মুণ্ডু এখন মাটিতে লুটোবে। পুছো কিউঁ ? পুছো। পুছো।

অদিতি বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, —কেন ?

—বিকজ ওই মামাশ্বশুরের এগেন্স্টে সি বি আই লেগেছে। দ্যাট ম্যান্ ইজ আ ডেড মিট্। সো রঙ্গনাথনের অর্ডার গন্। এখন গেরুয়া পরে ব্যাটাকে মাদ্রাজের রাস্তায় নামতে হবে। দে দে অর্ডার দে, অর্ডার দে, অর্ডার দেএ রে... হামে অর্ডার দে। হা হা হা।

বাবার সুরেলা কণ্ঠসঙ্গীত আর অট্টহাসির দাপটে খাওয়া শেষ করে উঠে এসেছে দুই ভাই।

সোফায় পা তুলে বসে তাতাই বলল, —বাবাকে রোজ একটা করে এরকম সিটিং দিতে বোলো না, দারুণ দারুণ গল্পের প্লট পেয়ে যাবে। তোমার ইনকামও হু হু করে বেড়ে যাবে।

—তুমি লিখে টাকা পাচ্ছ নাকি ?

অদিতি হাসল সামান্য, খবরের কাগজে গল্প লিখলে টাকা তো পাবই।

তাতাই ফুট কাটল, —পার স্টোরি মিনিমাম পাঁচ-ছ শো।

সুপ্রতিম থমকেছে। নাক নাচাচ্ছে ঘন ঘন। ঠোঁট কুঁচকে বলল, —মন্দ কী! যত সামান্যই হোক, মানি ইজ মানি। শাড়ির ব্যবসায় লেগে থাকতে পারলে এর থেকে অবশ্য বেশিই আসত। তবে এটা বলতে পারো, এখানে ইন্ভেস্টমেন্টটা কম। শুধু কাগজ কলম আর কালি। ব্যস্, আমি প্লট সাপ্লাই করে যাচ্ছি, তুমি লিখে যাও। হা হা।

প্রয়োজন ছাড়া পাপাই আজকাল বাড়িতে বিশেষ কথা বলে না। অদিতি সুপ্রতিম তাতাই কারও সঙ্গেই না। তার জি আর ই পরীক্ষার আর দিন পনেরো বাকি, বি এসসি-র রেজাল্ট বেরোতে মাসখানেক। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে বেশ চিন্তিত দেখায় তাকে। সে'ও আজ চুপ থাকতে পারল না। তরলভাবে বলল, —তোমরা লেখকদের অত হ্যালাফ্যালা কোরো না, লিখেও প্রচুর রোজগার হয়। বিদেশে এক একজন রাইটার শুধু লিখেই প্যালেস এরোপ্লেন দ্বীপ কত কী কিনে ফেলছে।

ব্যস, কথা ঘুরে গেল। কোন্ দেশে কোন্ লেখকের কী পরিমাণ রোজগার, কে কত বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, কে মাতাল, কে লম্পট, কে গাঁজা টেনে লিখতে বসে, কে চুল্লু, তাই নিয়ে ভুলভাল পর্যালোচনা শুরু হয়ে গেছে।

অদিতির হঠাৎ খুব কষ্ট হচ্ছিল। এত কিছু নিয়ে গবেষণা চলছে তিনজনের, কই একবারও তো কেউ জিজ্ঞাসা করল না কোন লেখাটা বার হচ্ছে অদিতির!

সব কিছুর মধ্যেই টাকার গন্ধ খোঁজে, এরা কারা ? অদিতিরই স্বামী ? অদিতিরই সন্তান ? ওই যে পাপাই, কৃতকার্যের জন্য এতটুকু অনুতপ্ত হল না, উল্টে ভাব দেখায় যেন অদিতিই তার ব্যক্তিগত জীবনে এক হীন অনুপ্রবেশকারী, এখনও বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে ফোনে একইভাবে ফস্টিনস্টি করে চলে, তাকে তো ক্ষমা করেছিল অদিতি, তবু যে কেন এক তীক্ষ্ণ শলাকা বুকে বিঁধে থাকে ! ছেলেকে মার্জনা করা মা-র পক্ষে খুব সহজ কাজ, কিন্তু সন্তানের দুষ্কর্ম বিস্মৃত হওয়া বড় কঠিন, বড্ড কঠিন। আর ওই যে তাতাই, অদিতির সদাহাস্যমুখ ছোট ছেলে, সে তো এক ভাবী বানিয়া ! না হলে ওইটুকু ছেলে এখন থেকেই শেয়ারবাজার নিয়ে মাতামাতি করে !

অদিতি ঘরে যেতে গিয়েও ফিরে এল। সুপ্রতিমকে বলল, —তোমাকে আরেকটা দরকারি কথা বলা হয়নি। সামনের রবিবার এই ফ্ল্যাটে একটা সাহিত্য সভা হবে।

—এখানে ? রবিবার ? ছুটির দিনে ?

—একটা রবিবার নয় হলই। অদিতি গম্ভীর।

অদিতির মুখের দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম কি বুঝল কে জানে, হাত উল্টে বলল, —ও কে। ও কে। শুধু একটা প্রবলেম...

—কী ?

—তথাগত বলছিল সামনের রবিবার আসবে...

—বারণ করে দিয়ো। পরের রবিবার আসতে বোলো। ও হ্যাঁ, আরও একটা কথা। হেমেনমামা আর রঞ্জনকে ওই দিন দুপুরে খেতে বলব ভাবছি।

—হঠাৎ ?

—আমার ইচ্ছে।

অদিতি আর দাঁড়াল না। এক নিঃসীম শূন্যতা ছেয়ে ফেলছিল তাকে।

পরদিন খুব ভোরে, গোটা ফ্ল্যাট যখন ঘুমিয়ে আছে, অদিতি বেরিয়ে পড়ল নিঃসাড়ে। বাড়িতে খবরের কাগজ আসার এখনও অনেক দেরি, তার আগেই নিজের গল্পটাকে একবার ছুঁতে চায় অদিতি।

একা।

॥ চোদ্দো ॥

এক হেমন্তের শুরুতে এসেছিল টিয়া, পরের হেমন্ত ফুরোবার আগেই অপরূপ এক বদল ঘটেছে তার। বুলি ফুটেছে মুখে। টিয়ার শব্দভাণ্ডারটি বড় নয়, বরং খুবই ছোট, মাত্র একটি শব্দ জমা হয়েছে তার ভাঁড়ারে। খুকু। শিস নয়, অন্য কোন নাম নয়, শুধু খুকু।

ওই শব্দটুকুই ঘুরে ফিরে আওড়ায় টিয়া। সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, যখনই শোন শুধু খুকু আর খুকু। শুনতে শুনতে বাড়িসুদ্ধু সকলের কান

ঝালাপালা হয়ে গেল। এক অদিতি ছাড়া। একটি শব্দেই অদিতির টিয়া প্রমাণ করেছে সে গোঙা নয়, এর বেশি আর টিয়ার কাছে কী চাওয়ার আছে অদিতির !

পাখির আজকাল তেজও বেড়েছে। খুব ডানা ঝাপটায়, ঝটপট ঝটপট শব্দে তোলপাড় হয় খাঁচা। চট করে দেখে মনেও পড়ে না কোন্ ডানাটা কমজোরি হয়েছিল টিয়ার, কোথায় বা থাবা বসিয়েছিল বেড়াল।

অদিতি অবশ্য টিয়ার দিকে নজর দেওয়ার সময় পায় না এখন। কোন্ দিকেই বা পায় ! গল্প লেখা এক সময়ে তার কাছে ছিল স্রেফ ব্যসন, অবসরের সঙ্গী। এখন আর তা নেই। ক মাসের শখ কখন যেন সাধনা হয়ে গেছে। শুধু দুপুরই নয়, লেখা এখন সারাদিনই অদিতিকে অধিকার করে থাকে। লেখার মাঝে সে সহজে ওঠে না, লেখার সময়ে পাড়াপ্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন এলে সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। পাপাই তাতাই হুটহাট এসে পড়লেও অবলীলায় বলে দেয় অমুক জিনিস অমুক জায়গায় আছে, নিজেরা নিয়ে নাও। সন্ধেটুকুই শুধু লেখে না অদিতি। রাত্রে বসে আবার। রোজ না হলেও প্রায়ই। নির্জন রাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না, অদিতি অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে তখন।

রাতের সাধনাতেও বিঘ্ন এল। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল সুপ্রতিমের। ফটফটে আলো জ্বলছে ঘরে, মেঝেতে বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে লিখছে অদিতি, সেদিকে তাকিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সুপ্রতিম বলল, —কী আরম্ভ করলে ! একটু শান্তিতে ঘুমোতে দেবে না ?

অদিতি বলল, —কেন, আমি তো তোমার ঘুমিয়ে পড়ার পর লিখতে বসেছি।

সুপ্রতিম বলল, —এই রাত দুপুরে কি না লিখলেই নয় ?

অদিতি হাসল একটু, —কী করি বলো, রাত্রে যে অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা এসে যায় মাথায় ! জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে কত পুরনো ছবি দেখতে পাই, চোখের সামনে কত ঘটনা ভেসে ওঠে। লেখার সময়ে এগুলো বড় কাজে লাগে গো।

সুপ্রতিম বেজার মুখে বলল, —সে চিন্তাদের গুছিয়ে গাছিয়ে দিনভর লেখো না, কে তোমাকে বারণ করেছে !

অদিতি বলল, —ঘুম থেকে উঠলে ছবিগুলো যে আর মাথায় থাকে না, পুরো ভ্যানিশ হয়ে যায়।

সুপ্রতিম গজগজ করল, —তার জন্য আমাকেও রাতভর জেগে বসে থাকতে হবে ! জানো আমি আলোয় ঘুমোতে পারি না। সারাদিন খেটেখুটে এসে এ-সব আর ভাল্লাগে না।

অদিতি বলতে পারত গত চব্বিশ বছরে বহু দিন সুপ্রতিম রাত জেগে অফিসের কাজ করেছে। অদিতিরও অন্ধকার ছাড়া ঘুম আসে না, তা সত্ত্বেও

সুপ্রতিম আলো নেবায়নি। এখনও মাঝে মধ্যে তাতাই-এর সঙ্গে বসে টিভিতে লেট নাইট মুভি দেখে সুপ্রতিম, গত হপ্তাতেও রাত তিনটে অব্দি ফুটবল খেলা দেখল, তখন তো রাত জাগার কথা ওঠে না! অদিতিরও তো সে সময়ে অসুবিধে হয়, অদিতি কোনওদিন বলতে গেছে! অদিতির শরীর কি শরীর নয়!

কিছুই বলল না অদিতি। শান্তভাবে কাগজপত্র গুছিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সে রাতে। পরদিনই বেরিয়ে দোকান থেকে একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে এনেছে। কী আর করা, মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে খেতে লেখার অভ্যাসটা রাত্রে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে অদিতিকে লিখতে দেখে প্রথম দু চার দিন সুপ্রতিম হাসাহাসি করল। তুমি দেখছি নোবেল লরিয়েট না হয়ে ছাড়বে না! তারপর দুম করে একদিন বলে বসল, —এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অদিতি।

অদিতি বলল, —এতেও কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

সুপ্রতিম বলল, —আমার সুবিধে অসুবিধের কথা হচ্ছে না। সব কিছুর একটা ডিসেন্সি আছে। তুমি তো আর লিখে রোজগার করে খাচ্ছ না, যে রাতদিন এরকম মুখ গুজে লিখে যেতে হবে! আমার দেখতে খারাপ লাগে।

অদিতি বলে ফেলল, —তার মানে বলতে চাইছ রোজগার করে খেতে গেলে ডিসেন্সি, লিমিট এ সব না রাখলেও চলে?

সুপ্রতিম গুম হয়ে গেল।

অদিতি পড়াশুনোও শুরু করছে নতুন করে। তার এতদিনকার ছোট্ট পৃথিবীটার বাইরেও যে এক বৃহৎ জগত আছে তাকে জানার জন্য তার এখন উদগ্র পিপাসা। বিষয় নিয়ে খুব একটা বাছাবাছি নেই অদিতির। গল্প উপন্যাস শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস যা হেমেন মামা এনে দেয় তাই গোগ্রাসে পড়ে ফেলে। গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বড় লাইব্রেরি আছে, তার মেম্বার হয়েছে অদিতি, সেখান থেকেও বই নিয়ে আসে। রঞ্জনের কাছ থেকে পায় হরেক কিসিমের লিটল্ ম্যাগাজিন, তাও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

অদিতির বাড়িতে সাহিত্যসভাও শুরু হল। বেশ কিছু তরুণ লেখকের সমাবেশ ঘটল বাড়িতে। হেমেন এবং রঞ্জনই মূল উদ্যোক্তা। স্বরচিত গল্প পাঠ হল, অদিতির ড্রয়িং স্পেস কাঁপিয়ে প্রবল তর্ক বিতর্কের তুফান উঠল, গল্প নিয়ে কাটাছেঁড়াও চলল প্রচুর। বিকেল থেকে সন্ধে অদিতির ফ্ল্যাট জমজমাট। হেমেনের সঙ্গে প্রেমতোষের সভাতেও বার কয়েক আরও গেছে অদিতি, তবে সেখানকার পরিবেশ অনেক বেশি গুরুগম্ভীর, তুলনায় অদিতির বাড়ির আসর অনেক স্বচ্ছন্দ। প্রেমতোষের বাড়িতে সবাই প্রায় শ্রোতা, এখানে লেখকদেরই সাবলীল জটলা। কত ধরণের ছেলে যে আসে! কেউ সারাক্ষণ অস্বাভাবিক গম্ভীর, কেউ বা তুবড়ির মতো কথা বলে চলেছে। কেউ অসম্ভব

লাজুক, স্বপ্নালু চোখে নিজের গল্পটি পড়ে মাথা হেঁট করে আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, কেউ বা সামান্যতম সমালোচনাতেই বুনো কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সকলের মধ্যেই এক ধরণের উত্তাপ টের পায় অদিতি। সহমর্মীর উত্তাপ। সহধর্মীর উত্তাপ। তরুণদের সান্নিধ্যে বেশি দিন জড়তা বজায় রাখা কঠিন, অদিতি এখন নিঃসঙ্কোচে যে কোনও লেখা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে।

প্রথম দিনের সভায় এলাহি জলখাবারের বন্দোবস্ত করল অদিতি। লুচি আলুর দম ভেজিটেবল্ চপ মিষ্টি। নিজের হাতে লুচি ভেজে আনল সকলের জন্য, চা করল বার দু তিন।

সেদিন সভা শেষ হওয়ার পরেই হেমেন ধরলেন অদিতিকে, —এখানে যত বারই সভা হবে, তত বারই এত আয়োজন করবে নাকি ?

অদিতি বলল, —বারে, সবাইকে আমন্ত্রণ করে এনেছি...

হেমেন বললেন, —সে তো এখানে সভা করার জন্য, খাওয়ানোর জন্য নয়। এর পর থেকে তুমি আর এত ঝামেলায় যাবে না।

অদিতির মুখ করুণ হয়ে গেল। ওই সব প্রাণবন্ত ছেলেদের খাওয়াতে ভালই লেগেছে তার, হেমেন মামা শুধু শুধু আপত্তি করছে কেন ! বলল, —তা হলে নেক্সট্ সভা থেকে খাওয়া বন্ধ ?

হেমেন বললেন, —বন্ধ করবে কেন ? সাহিত্যের যা নির্ভেজাল সঙ্গী, তা তো থাকবেই। মুড়িবাদাম আর চা। ওই চায়ের কষ্টটুকুই তোমাকে করতে হবে বার কয়েক। তোমার ছেলেদের বোলো না, তোমাকে একটু হেলপ্ করে দেবে।

অদিতি শুনে হেসেছিল মনে মনে। তার ছেলেরা করবে সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ ! সাহিত্যের নাম শুনলেই দুই ছেলে দু দিকে পোঁ পোঁ দৌড়তে থাকে। এক্তু বোরিং ! এত বোরিং ! পাপাইএর জিআরই পরীক্ষা হয়ে গেল, বিএসসির রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। যথারীতি ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে পাপাই, এমএসসিতে ভর্তিও হয়ে গেছে। তবে এখনও তার মন জিআরইর রেজাল্টের দিকে, অদিতি বুঝতে পারে। যাক, যে যেভাবে থেকে খুশি থাকে থাকুক।

আশ্চর্যের বিষয়, সুপ্রতিম কিন্তু প্রথম দিনের সাহিত্যসভায় ছিল। হয়তো বা অদিতির অনুরোধ রাখতে। অথবা নতুন ধরণের মজা চাখার বাসনায়।

থাকার ফলটা অবশ্য শুভ হল না। অদিতির পক্ষেও না। সুপ্রতিমের পক্ষেও না।

উৎসাহের ঝোঁকে নবীন লেখকদের মধ্যে থেকে এক কোমলদর্শন যুবককে পাকড়াও করল সুপ্রতিম। মুরুব্বি চালে আলাপ জমাল ছেলেটির সঙ্গে।

আলাপটাই কাল হল। ছেলেটা এ-কথা সে-কথার মাঝখানে ঝপ করে বলে বসল, —আপনি তো খুব বড় চাকরি করেন, তাই না ?

সুপ্রতিম হাসতে হাসতে বলল, —বাহ্, এ-খবরও জানা হয়ে গেছে। কে

বলল ?

—হেমেনদা বলছিলেন। ...আপনি নাকি লোটাস ইন্ডিয়ার গোটা পূর্বাঞ্চলের সর্বেসর্বা।

—নারে ভাই, ওই সেলস্‌টা দেখাশোনা করি আর কী।

ছেলেটি টুপ করে বলল, —আপনাদের কোম্পানী তো বিজ্ঞাপনে অনেক খরচা করে, আমাদের পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিন না।

অদিতি সুপ্রতিমের পাশে বসে ছেলেটির কথা শুনছিল, বায়নার সুরে বলল, —হ্যাঁগো, দাও না।

—হ্যাঁ, তা ব্যবস্থা একটা করা যায়। কী নাম আপনার পত্রিকার ?

—রোহিণী।

সুপ্রতিম পেশাদারী স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —সেল্ কী রকম ?

—ভাল। বেশ ভাল। লাস্ট ইস্যুটা আমাদের চারশো কপি ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে হার্ডলি ষাট কপি পড়ে আছে। ...গোটা চল্লিশ কম্‌প্লিমেন্টারি গেছে...তার মানে শ তিনেক কপি তো বিক্রি হয়েছেই।

সুপ্রতিম তাকাল এদিক ওদিক। বুঝি দু চারটে নিশ্বাস নিল, —মাত্র তিনশো ?

—কেন, তিনশো কম নাকি ? আমাদের এন্‌টায়ার কাগজের দাম উঠে গেছে।

—আর ছাপার খরচ ?

—ওই দু একটা বিজ্ঞাপনও আসে, বাকি যা শর্ট পড়ে পকেট থেকে যায়।

সুপ্রতিম হা হা হাসল, —তার মানে আপনার ট্যাঁকের জোর আছে।

—জোর থাকলে কী আর বিজ্ঞাপন চাইতাম ! টিউশ্যনির টাকায় সব ইস্যু টাইম্‌লি বার করতে পারি না...

সুপ্রতিমের চোখ গোল হয়ে গেল, —আপনি চাকরি করেন না ?

ছেলেটা বলল, —চাকরি করলে কি আর ভাবনা ছিল ! পত্রিকাটা কত বড় করে বার করতে পারতাম।

সুপ্রতিম আরও অবাক, —শুধু পত্রিকা বার করার জন্যই চাকরি পাওয়া দরকার ?

ছেলেটা দিব্যি বলে দিল, —চাকরি পেয়ে যদি পত্রিকাই না বড় করতে পারি তা হলে সে চাকরি করে আমার লাভ কী।

—আপনার বাড়িতে কেউ নেই ? মা, বাবা ?

—হ্যাঁ, সবাই আছে। মা বাবা ভাই বোন। কেন বলুন তো ?

সুপ্রতিম ধন্দ মারা মুখে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে চলে গেল। রাত্রে ধরল অদিতিকে, —তোমার সাঙ্গোপাঙ্গোরা যে দেখছি সব বদ্ধ পাগল !

অদিতি টেরচাভাবে হাসল, —একটা বিজ্ঞাপন চেয়েছে বলে পাগল হয়ে গেল !

—তিনশো কপি কাগজ বিক্রি হয় তার জন্য আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে হবে ? টাকা কি খোলামকুচি ?

অদিতি তর্ক জুড়ল, —টিভিতে অসভ্য নাচগানের জন্য তোমরা লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন দিতে পারো, আর এই সামান্য একশো দুশো টাকা... একটা ভাল কাজের জন্য নয় দিলেই। তবু একটা ক্রিয়েটিভ কিছুর মধ্যে রয়েছে ছেলেগুলো !

—ক্রিয়েটিভ না হাতি। উচ্চণ্ড পাগলামি। ফ্যামিলির চিন্তা নেই, টাকা উড়িয়ে পত্রিকা বার করা ! হুঁহ্।

—সবাই কি এক ছাঁদের হবে নাকি ! অফিস আর রোজগার !

—থাক থাক জ্ঞান মেরো না। তোমাদের ওই ফালতু ব্যাপারে আমাকে আর জড়াবে না।

ব্যস্ হয়ে গেল। আর চোরে কামারে দেখা নেই। দ্বিতীয় সাহিত্যসভার দিন আগরতলায় ছিল সুপ্রতিম, তৃতীয় আসরের দিন প্রথম অতিথি ডোরবেল্ বাজাতেই চোস্ত্ পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে সোজা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরল দুপুররাতে। পুরো চুর হয়ে। যা সে কদাচ হয়।

ফিরেই হুঙ্কার, —তোমার সব অপোগণ্ডের দল গেছে ?

অদিতি স্তম্ভিত। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধমকাল সুপ্রতিমকে, —হচ্ছেটা কী ? মাঝরাতে ফিরে হল্লা করছ কেন ?

—বেশ করছি। আমার বাড়িতে আমি যা খুশি তাই করব। কোথায় তোমার সেই হারামজাদার দল ?

—ও কী ভাষা ! হারামজাদা শব্দের মানে জানো ?

—না। তোমার কাছে শিখতে হবে ! চটি খুলে দরজার দিকে ছুড়ল সুপ্রতিম। বেসামাল পায়ে শোওয়ার ঘরে গেল। গজরাচ্ছে, —খুব ভাষার ধ্বজা ওড়াতে শিখেছ অ্যাঁ ? ওফ্, জীবনটা আমার হেল্ করে দিল।

অদিতি শান্ত করার চেষ্টা করল সুপ্রতিমকে। বলল, —এরকম করছ কেন ? মাসে তো মাত্র একটা দিন...

—তাই বা হবে কেন ? আমার একটা ছুটির দিনে আমারই ফ্ল্যাটে একপাল সুগ্রীব আর অঙ্গদ নাচানাচি করবে, এ কি মামদোবাজি ?

অদিতি তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে দিল, —কী আরম্ভ করলে কী ? পাপাই তাতাইয়ের ঘুম ভেঙে যাবে যে !

—যাক। সব্বাই শুনুক। স্খলিত পায়ে দরজা খুলে দিয়েছে সুপ্রতিম, —অ্যাই পাপাই, অ্যাই তাতাই, তোরাই বল্, এ কি মামদোবাজি ?

অদিতি টেনে হিঁচড়ে সুপ্রতিমকে বসিয়ে দিল বিছানায়। হিসহিসিয়ে উঠল, —আমার বন্ধুরা এখানে আসে বলেই যত রাগ, তাই না ? তোমার বন্ধুরা যে সারা সন্ধে তাণ্ডব করে যায়, তার বেলা ?

সুপ্রতিম ফুঁসে উঠল, —আমার বন্ধুরা তোমার ওই লাফাঙ্গাদের মতো

ভিখিরির বাচ্চা নয়। কোত্থেকে শালা এক বুড়ো ভাম মামা জুটেছে, মাথাটা একেবারে চিবিয়ে ঝরঝরে করে দিল! তোমাকে লেখিকা বানানোর জন্য তার এত কীসের ইন্টারেস্ট, অ্যাঁ? গাদা গাদা ছেলে এনে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যখন তখন তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে কী এ-সবের বোঝো?

অদিতি স্তব্ধ হয়ে গেল। কার্নিশের বেড়ালটা যেন হৃৎপিণ্ডে নখের আঁচড় টানছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আসছে শরীর। কেটে কেটে বলল, —মাতলামির ঝোঁকে তুমি কী বলছ তুমিই জানো। একটা কথা শুনে রাখো, আমার বন্ধুরা এখানে আসবে। আমার মামাও আসবে। এটা যেমন তোমার ফ্ল্যাট, আমারও ফ্ল্যাট।

—তোমার বাপ দাদা এই ফ্ল্যাট উইল করে দিয়ে যায়নি। এটা আমার রোজগারের টাকায় করা, বুঝেছ?

—সংসারের পেছনে আমার বুঝি কোনও খাটুনি নেই? তার বুঝি দাম নেই?

—চোপ। একটা কথাও নয়। মাগ্‌না খাটছ? যা চাও তাই তো দেওয়া হয়। সুপ্রতিম অসংলগ্ন স্বরে চেল্লাচ্ছে, —আমার ফ্ল্যাটে এ-সব আর চলবে না। আই ডু হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার...

অদিতি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলল, —এ কথা এতদিন পরে মুখ থেকে বেরোল?

—আগেও বলতে পারতাম। বলিনি। মার্সি। ওয়াচ করছিলাম। ভেবেছিলাম কাজকর্ম নেই, একটা কিছু নিয়ে থাকবে...। সাহিত্যফাহিত্য অনেক হয়েছে। এবার ও-সব ছাতার মাথা বন্ধ করো। এটা হল গিয়ে হোম। আ প্লেস অফ হ্যাপিনেস্। এখানে আমাদের সুখ বিঘ্নিত হওয়া আমি অ্যালাও করব না।

অদিতি চৈতন্যের শেষ সীমায়। মাতালের প্রলাপ, না মনের কথাই উগরে দিচ্ছে সুপ্রতিম? হৃদয়ের গভীরে, অনেক গভীরে, কোথায় যেন একটা ভূমিকম্প হচ্ছে, টের পাচ্ছিল অদিতি। চব্বিশ বছর ধরে গড়ে ওঠা ধারণার ইমারত— অদিতিই এই সংসারের চালিকাশক্তি— ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে যেন।

নিশ্বাস বন্ধ করে অদিতি বলল, —বেশ, তোমরা যা চাও তাই হবে।

বাতাসে এখন হিমরেণু। দূরের পর্বত তার জমাট দুঃখের নিশ্বাস পাঠাচ্ছে এই শহরে। নিজের ডানায় ঠোঁট গুজে ওম খুঁজছে পাখি। বড় শীত। এত শীত যে হাড় মজ্জা কাঁপছে অদিতির।

বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে সুপ্রতিম। একটা পা খাটের বাইরে ঝুলছে। অদিতি পা-টা তুলে দিল বিছানায়, নরম লেপে ঢেকে দিল সুপ্রতিমকে, মশারি টাঙাল। মেঝেতে লুটিয়ে থাকা সুপ্রতিমের শাল গুছিয়ে রাখল ওয়ার্ড্রোবে।

আলো নিবিয়ে লেখার চেয়ারে এসে বসেছে অদিতি। বসেই আছে।

সুইচ টিপে অদিতি টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। মুহূর্তে ঘরের কোণ ঝলসে উঠেছে আলোয়। পরক্ষণে নেবাল। অন্ধকার। আবার জ্বালাল বাতি। আবার নেবাল। জ্বালাচ্ছে। নেবাচ্ছে। জ্বালাচ্ছে।

অনেক প্রশ্ন। অনেক প্রশ্ন।

দিন পাঁচেক পর একদিন ছোট ননদের বাড়ি গেল অদিতি। দু দিন ধরে ফোন আসছে, রিনার বড় মেয়েটা খুব অসুস্থ, একবার না গেলে খারাপ দেখায়। গিয়ে দেখল জ্বর একটু কমেছে, তবে সাংঘাতিক কাশিতে ভুগছে মেয়েটা। ডাক্তার সন্দেহ করছে ব্রংকাইটিস্, এক্সরে করতে বলেছে, হয়েও গেছে আজ, রিনার বর অফিস থেকে ফেরার পথে রিপোর্টটা আনবে।

ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখিয়ে রিনার বর বাড়ি ফিরল দেরিতে। অদিতি অপেক্ষা করছিল। এক্সরেতে কিছু পাওয়া যায়নি, সাধারণ কাশি, কাফ সিরাপ দিয়েছে ডাক্তার। রিনার বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরোতে বেরোতে নটা বেজে গেল অদিতির।

বাড়ি ফিরে অদিতি দেখল সুপ্রতিম সকাল সকাল ফিরে এসেছে আজ। সেন্টার টেবিলে পা তুলে, শরীর শালে মুড়ে, একটা অ্যাকশান ফিলম্ দেখছে টিভিতে। অদিতিকে দেখে বলল, —কেমন আছে রিঙ্কি ?

অদিতি এখন চুপচাপ হয়ে গেছে খুব। প্রবল এক অভিমানে বুকের ভেতরটা পুড়ে গেছে তার, কিন্তু মুখে সে কিছুই প্রকাশ করে না। নিয়ম মতোই কাজকর্ম করে যাচ্ছে সংসারের, যেখানে যা কর্তব্য আছে পালন করছে, দুপুরবেলা এক অপ্রতিরোধ্য মানসিক তাড়নায় লিখতেও বসেছিল দু দিন, শুধু বাড়ির কারও সঙ্গে অদিতি যেচে কথা বলছে না। ছেলেদের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। মা-র কোনও পরিবর্তন এলেও তাদের এখন দেখার চোখ কোথায়! অথবা সময়! যে যার মনে বেরিয়ে যায়, ফেরে, খায়, শুয়ে পড়ে এবং রুটিনমাফিক হুকুম ছুড়ে যায় মাকে। সুপ্রতিমও তার সেদিনের ব্যবহারের জন্য খুব একটা অনুতপ্ত বলে মনে হয় না। যেন সেদিন নেশার ঝোঁকে কিছুই তেমন হয়নি। যেন সেদিন কিছুই তেমন বলেনি অদিতিকে।

শীতটা জাঁকিয়ে এসেছে। খালি পা মেঝেতে পড়লে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে। বাইরের চটি ছেড়ে হাওয়াই চপ্পল পায়ে গলাল অদিতি। বলল, —ভালই আছে। কাশিটা জ্বালাচ্ছে একটু।

—সিরিয়াস কিছু ?

—না।

সুপ্রতিম টেবিলে পা নাচাচ্ছে, —এদিকে তো একটা ভাল খবর আছে।

অদিতি কৌতূহল দেখাল না।

সুপ্রতিম নিজেই বলল, —পাপাইয়ের আজ জি আর ই-র রেজাল্ট বেরিয়েছে। দারুণ রেজাল্ট করেছে তোমার ছেলে। নাচতে নাচতে বন্ধুদের

নাইট শোয়ে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল।

—তাই বুঝি ? অদিতির স্বর নিরুত্তাপ।

—আমি অবশ্য ওদের রেজাল্ট-ফেজাল্ট তেমন বুঝি না, তবে পাপাই বলল ওর স্কোর নাকি খুব ভাল। হয়তো কোনও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতে পারে।

—ভালই তো। অদিতি শাড়ি বদলাতে ঘরে ঢুকে গেল।

তাতাই ঘরে আছে, টেবিলে খাবার সাজিয়ে তাকে ডাকল অদিতি। সুপ্রতিমকেও। খাচ্ছে তিনজনে।

আলুকপির ডালনায় রুটি ডুবিয়ে সুপ্রতিম বলল, —আমি একটা কথা ভাবছিলাম, জানো ?

—কী ?

—তুমি তো অনেক দিন ধরেই ফ্ল্যাটটা রঙ করানোর কথা বলছ। গত শীতে হল না, এই শীতে করিয়ে দিই, কি বলো ?

—করাও।

— কী রঙ করলে ভাল হয় বলো তো ?

তাতাই ঝাঁপিয়ে বলল, —বেজ্ কালার। বেজ্ কালার।

সুপ্রতিমের ভুরু কুঁচকোল, —সেটা কী রঙ ?

—ঠিক চন্দনও নয়, মাটিও নয়, ও আছে একটা। চার্ট দেখলে বুঝতে পারবে।

সুপ্রতিম চোখের কোণ দিয়ে দেখল অদিতিকে, —না না। তোমার মা যে রঙ চুজ করবে সেটাই হবে।

—মা-র বেজ্ কালার খুব পছন্দ, আমি জানি। তাই না মা ?

—তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ। ক্যাসারোলের দিকে হাত বাড়াল অদিতি, —তুই আর রুটি নিবি ?

—একটা।

সুপ্রতিম বলল, —কাল তা হলে মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলি। ঘরদোর দেখে একটা এস্টিমেট করে দিয়ে যাক।

অদিতি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

সুপ্রতিম ঠোঁট ছুঁচোল করে দেখছে অদিতিকে। হঠাৎ বলে উঠল, —বুঝলি তাতাই, আমি আরেকটা কথাও ভাবছিলাম।

—কী ?

—ওই যে তোর দাদা একবার বলেছিল না, তোর মা লিখতে পারলে একটা বই বার করে দিতে ! তোর মা তো অনেকগুলো গল্প লিখে ফেলল, ভাবছি সব কটা এক জায়গায় করে একটা বই ছেপে দিই। কেমন হয় ?

চতুর তাতাই মুচকি হাসল। দেখল বাবা মাকে। বলল, —দারুণ।

—তুই তো কলেজ স্ট্রিটের দিকে যাস্, খোঁজখবর নিস্ তো কীরকম

খরচ-খরচা পড়বে।

অদিতি নিস্পৃহ স্বরে প্রশ্ন করল, —কপির তরকারিতে নুন ঠিক আছে? সবিতার আজকাল নুনের হাতটা বড় বেড়েছে।

সুপ্রতিম যেন হোঁচট খেল একটু। কথা থামিয়েছে এতক্ষণে। মন দিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

শোওয়া হল আজ রাত করে। পাপাই ফেরার পর তাকে খাবার গরম করে দিল অদিতি। জি আর ই-র রেজাল্ট নিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ উল্লাস প্রকাশ করল পাপাই, অদিতিও হাসল। মাপা হাসি।

লেপের তলায় ঢুকে সুপ্রতিম বলল, —তোমার কী হয়েছে বলো তো?

অদিতি আলো নিবিয়ে দিয়েছে। আলগাভাবে বলল, —কিছু না তো।

—তুমি কি আমার ওপর রেগেই থাকবে ফুল? নেশার ঝোঁকে কী বলে ফেলেছি...

অদিতি বলল, —আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি রাগ করে আছি?

—একটা ভাল খবর পেলে, দু দুটো এক্সাইটিং প্ল্যান শোনালাম, তোমার মুখে হাসি নেই কেন?

—কোন্‌টা তোমার এক্সাইটিং প্ল্যান? বাড়ি রঙ করা, না আমার বই ছেপে দেওয়া?

অন্ধকারে চুপ সুপ্রতিম। নীরবতায় ঘরের অন্ধকার আরও গাঢ় যেন। তলহীন। মিশমিশে।

হঠাৎ সুপ্রতিম হাত বাড়িয়ে ছুঁল অদিতিকে, —দ্যাখো ফুল, আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর হতে চলল, তুমিও আর কনে বউটি নেই, আমিও আর সেই নার্ভাসি বর নয়, এখন কি আমাদের মধ্যে কোনও মান-অভিমান খেলা সাজে? আমরা দুজনে দুজনকে হাতের তালুর মতো চিনি, এখন কি আমাদের মধ্যে কোনও মিস্‌আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসা উচিত?

অদিতি উত্তর দিল না।

সুপ্রতিম আরেকটু ঘন হয়েছে, —হ্যাঁ, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হয়। হতেই পারে। তুমিও জানো আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি, আমিও জানি তুমি আমাকে কতটা ভালবাসো, আমরা কেউই কারও খারাপ চাই না। চাই কি?

সুপ্রতিমের স্বরে বুঝি সংশয়! না হলে বিয়ের চব্বিশ বছর পরে এত ভালবাসি বলার আধিক্য কেন?

অদিতি বলল, —ও কথা থাক্।

—থাকবে কেন? এ-সব কথা বলা দরকার। সুপ্রতিম কাশল খুক খুক। গলা ঝেড়ে বলল, —তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো আমি যা করি তোমার ভালর জন্যই করি। তুমি ভুল পথে গেলে আমি তোমাকে আটকাতে চাইব, আমি ভুল করলে তুমি। দীপক শর্মিলার ঝঞ্ঝাটে তুমি আমাকে থাকতে বারণ করলে,

আমি সরে এলাম। তারপর দীপক শর্মিলার ডিভোর্স হয়ে গেল, শর্মিলা ছেলের কাস্টডি পেল, আমি আর ওখানে মাথা গলিয়েছি ? দীপককে স্ট্রেট বলে দিয়েছি, আমার বউ পছন্দ করছে না, আমি আর তোর সঙ্গে নেই। বিশ্বাস না হয় দীপকের সঙ্গে দেখা হলে তুমি জিজ্ঞেস কোরো। আমাদের এখন কত সুন্দর একটা ফ্যামিলি লাইফ, দু দুটো এবল্ ইন্টেলিজেন্ট ছেলে, একটা ওয়েলনিট্ ফ্যামিলি...ঝকঝকে ফ্ল্যাটে শ্রাবণ মাসে জমিয়ে পঁচিশ বছর সেলিব্রেট করব... আমরা এখন আমাদের মধ্যে ইনট্রুডার আসতে দেব কেন ?

অদিতি অন্ধকারে হাসল। বিষণ্ণ হাসি। ঘরের শীত যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল হাসিতে।

সুপ্রতিম জড়িয়ে ধরেছে অদিতিকে। কানের কাছে মুখ এনে বলল, —যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।

—বলো।

—তোমার হেমেনমামা আজ এসেছিলেন। আমি তাঁকে খুব ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি, তুমি একজন সম্মানিত মহিলা। একজন হাউসওয়াইফ। তোমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়।

অদিতি আর স্থির থাকতে পারল না। লেপ ফেলে ছিটকে উঠে বসেছে, —কখন এসেছিল হেমেনমামা ?

—সন্ধেবেলা। আগামী সপ্তাহে তোমাকে বারাসত না কোথায় নিয়ে যাবে বলছিল, আমি না বলে দিয়েছি। খারাপ ব্যবহার করিনি, খুব ভাল ভাবেই বলেছি। তাতাই সামনে ছিল, তাতাইকে জিজ্ঞেস কোরো। সুপ্রতিমের স্বরে এতটুকু জড়তা নেই, নির্দ্বিধায় বলে যাচ্ছে, —তোমার মধ্যে একটা কোয়ালিটি আছে, ভদ্রলোক সেটাকে এক্সপ্লোর করেছেন, তার জন্য আমরা গ্রেটফুল। তোমার গুণের কদর তো আমরাই করতে পারি। করেছিও তো। করিনি ? পাঁচজনকে বলে বেড়াই না তোমার গুণের কথা ? তা বলে ঘরদোর ফেলে অত নাচানাচি করার কী আছে ? মেয়েদের একটু দূরত্ব রেখে চলাই ভাল। এতে সম্মান বাড়ে, সংসারেরও বনেদটা শক্ত থাকে। নিজে বিয়ে থা করেননি, উনি বিবাহিত মেয়েদের মানসম্মানের কথা কী বুঝবেন ? তুমি তো লেখার জন্য সংসার ভাসিয়ে দিতে চাও না। নাকি চাও ?

বাইরে শীতার্ত রাত। লেপ ছাড়া ঠায় বসে আছে অদিতি। ঠাণ্ডা লাগছে না তার।

সে এখন নিজেই বরফ।

॥ পনেরো ॥

বাড়িটার চেহারা দুঃস্বপ্নের মতন। কলকাতার এ অঞ্চলে জরাগ্রস্ত বাড়ির কমতি নেই, কিন্তু এ যেন একেবারে সৃষ্টিছাড়া। শুধু জীর্ণ শ্রীহীন নয়, প্রায় ভগ্নস্তূপ। পলেস্তারা কবেই খসে পড়েছে, সর্বাঙ্গে টেরাবাঁকা অজস্র ফাটল, ভাঙাচোরা লাল ইট টাটকা ঘায়ের মতো গাময় দাঁত ছিরকুটে আছে। দেখেই বোঝা যায় অন্তত পঞ্চাশ বছর এ বাড়ি স্নেহস্পর্শ পায়নি। ফাটলের খাঁজখোঁজ ফুঁড়ে ইতিউতি বট অশ্বত্থের শিকড়। তাদের বামনাকার শরীর ঝুলছে বাইরেব দেওয়ালে।

এমন একটা বাড়িতে থাকে হেমেনমামা!

মোটা কাঠেব প্রকাণ্ড সদর হাট করে খোলা। সামান্য দ্বিধা নিয়ে কড়া নাড়ল অদিতি। সাড়া নেই কারও। ভেতরে দেখা যায় এক চৌকো চাতাল, মেঝেতে তার পাথর ছিল এক সময়ে, এখন যত্রতত্র পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। ভরা দুপুরেও চাতাল ছায়াচ্ছন্ন, স্যাঁতসেঁতে। এক প্রান্তে বিশাল উঁচু এক চৌবাচ্চা, চাতাল ঘিরে বর্গাকার বারান্দা, বারান্দার গায়ে সার সার কোটর। কোনও কোনও কোটর থেকে আচমকা মহিলাকণ্ঠ ছিটকে আসছে, তারপরই অন্দর সম্পূর্ণ নীরব। কে যেন কাকে খুব জোরে বকে উঠল। একটা বাচ্চা কাঁদছে।

অদিতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। কেউ বেরোয় না কেন? ভুল বাড়িতে এল নাকি? ঠিকানাটা বোধহয় ছোটমামার কাছ থেকে ঠিকঠাক জেনে এলেই ভাল হত। ভুলই বা কী করে হয়! হেমেনমামা যে রকম বলেছিল তাতে তো এই বাড়িই হওয়া উচিত। হাতিবাগানে নেমে বাঁ ফুটপাত ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর দিকে এগোলে বাঁ দিকের প্রথম রাস্তা, রাস্তার বাঁ দিকের দ্বিতীয় গলি। গলিতে ঢুকে ডান হাতের চারটে বাড়ি ছেড়ে পঞ্চম বাড়িটাই তো...!

হৃদয়ের উত্তেজনা অদিতিকে তাড়িয়ে এনেছে আজ, কিন্তু কেন এল অদিতি? সুপ্রতিমের হয়ে ক্ষমা চাইতে? হেমেনমামা ক্ষমা করলেই কি সুপ্রতিমের দোষ মুছে যাবে? নাকি হেমেনমামার সামনে হাউহাউ করে কাঁদবে অদিতি? সেটা কি বেশি মেলোড্রামাটিক হয়ে যাবে না?

ফিরে যাবে অদিতি? এতটা পথ উজিয়ে এসে?

অদিতি আবার কড়া নাড়ল। এবার বেশ জোরে।

সাড়া মিলেছে। এক প্রৌঢ়া। চাতালে। ভারী শরীরটি ইটচাপা ঘাসের মতো সাদাটে। গোলাকাব মুখমণ্ডল বিরক্তিতে ভরপুর। হাত নেড়ে বলল, —আমাদের কিছু লাগবে না বাপু।

অদিতি সামান্য ঘাবড়ে গেল। কালো জরিপাড় ক্রিম রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে, বেশ দামি শাড়ি, গায়ে কাশ্মীরি শাল, কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ, ঝোলা নয়। তাও মহিলা তাকে সেলস্‌গার্ল ভেবে বসল!

অদিতি মরিয়া হয়ে বলল, —না, মানে আমি একটা দরকারে এসেছিলাম।

প্রৌঢ়া যেন বধির। অদিতির দিকে পিছন ফিরে উঁচু দড়ি থেকে শাড়ি নামাচ্ছে। শুঁকল শাড়িটা, কাঁধে ফেলল। ঘরের দিকে এগোতে এগোতে ঘাড় ঘুরিয়েছে, —দাঁড়িয়ে কেন? বললাম তো কিছু নেব না।

অদিতি ঠোঁট নাড়ার আগেই এবার উল্টো দিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক তরুণী। তুলতুলিরই বয়সী। ফুরফুরে রঙিন প্রজাপতির মতো হাবভাব, ঘড়ি বাঁধছে হাতে, মুখচোখে ভীষণ তাড়া। বারান্দা বেয়ে তরতরিয়ে অদিতির সামনে চলে এল মেয়েটা, —কী আছে, কী আছে? চটপট দেখান।

অদিতি গম্ভীরমুখে বলল, —আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি, তুমি আমাকে একটু হেল্‌প্ করতে পারো?

—ও, তাই বলুন। মেয়েটা যেন একটু হতাশ, —কাকে খুঁজছেন?

—হেমেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক। বহতা পত্রিকার সম্পাদক। এই বাড়িতেই থাকেন কি?

মেয়েটা রীতিমতো চমকেছে। হাঁ করে দেখছে অদিতিকে, —আপনি ছোট্‌দাদুকে খুঁজছেন!

অদিতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আন্দাজে আসাটা ভুল হয়নি।

মেয়েটা অপসৃত প্রৌঢ়ার দরজার দিকে তাকিয়ে নিল একবার, —উনি কিছু বললেন না?

অদিতির ভুরুতে ভাঁজ বাড়ছিল, —না। কেন?

—ওই রকমই স্বভাব। সেদিন আমার কলেজের একটা বন্ধু এসে ফিরে গেছে।

অন্য দিন হলে মেয়েটার কথা শুনে হয়তো হাসত অদিতি, আজ কেজো স্বরে বলল, —হেমেনমামা মানে হেমেনবাবু কি আছেন?

—ছোট্‌দাদু আপনার মামা!

—হ্যাঁ। আছেন উনি?

—কে জানে, ছোটদাদু কখন বাড়িতে থাকে, কখন থাকে না। হালকাভাবে কথাটা বলে কী ভাবল মেয়েটা, —এক কাজ করুন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যান। ডান হাতের তিনটে দরজা ছেড়ে ফোর্থ ঘরটা দেখবেন, যদি তালা ঝোলে তো নেই।

ক্ষয়াটে উঁচু উঁচু ধাপ। নড়বড়ে রেলিঙ। সাবধানে উঠছিল অদিতি। ছোটমামা বলত, হেমেনদের বাড়ি দেখে মাথা ঘুরে যায়। ঘোরেই বটে। এই সিঁড়ির কথাই কি বলেছিল ছোটমামা!

চতুর্থ দরজার সামনে পৌঁছে বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল অদিতির। তালাই ঝুলছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অদিতি তবু দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।

এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসেছেন পাশের ঘর থেকে, পিটপিট চোখে দেখছেন অদিতিকে।

অদিতি আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, হেমেনমামা এই ঘরেই থাকেন তো ?
লোলচর্ম বৃদ্ধার দন্তহীন মুখে আরও খানিক ভাঙচুর, —কে মামা ? —হেমেন মল্লিক। —অ। ঠাকুরপো এখন ভাগ্নীও জোটানো শুরু করেছে ! এতদিন তো হাঁটুর বয়সী সব ভাইদেরই দেখতাম ! বৃদ্ধার মুখে নিঃসীম অবজ্ঞা, —তা বাছা, সে তো নেই।
—কখন ফিরবেন ? অদিতিও গলাটাকে একটু কড়া করেছে এবার।
বৃদ্ধা আপাদমস্তক জরিপ করলেন অদিতিকে। তারপর হাত নেড়ে বললেন, —বলতে পারব না। সে কি কাউকে কিছু বলে যায় ?
—একটা খবর দিয়ে দিতে পারবেন ? বলবেন সেলিমপুর থেকে অদিতি মজুমদার এসেছিল।
—পারব না ! চিরকুট লিখে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাও।
অদিতির বিষণ্ণ মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল, —পাশের ঘরে থাকেন, কথা শুনে মনে হচ্ছে বউদি, একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারবেন না ?
—পাশের ঘরে থাকি বলে কি অপরাধ করেছি বাছা ? সে তো আমাদের সংসারের লোক নয়। বিভুঁই থেকে যখন ফিরল কত আদর করে বললাম, ঠাকুরপো তুমি আমাদের সংসারে থাকো, পেনশানের টাকা থেকে যা পারো দিয়ো। দু মাস খেয়েই বাবু রাগ দেখিয়ে হোটেলে খাওয়া শুরু করলেন ! অমন লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী বাছা ! কাজের মধ্যে কাজ তো গুষ্টির পিণ্ডি লেখা, তাও তো শুনি নিজে এখন লেখে না, অন্যের জন্য কাগজ বার করে। এই ভাবে পেনশানের টাকাগুলো তুই ওড়াবি, আর আমরা কিছু বলতে পারব না ! লোকের পোঁদে টাকা উড়িয়ে কি অমন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম হলি রে তুই ! আমরা বাছা থাকার ঠাঁই পাই না, বাবু একটা আস্ত ঘর বই খাতায় বোঝাই করে বসে আছেন ! মেজ তরফ সেজ তরফ তো তাক করে আছে কাকা মরলেই ঘরটা নেবে। আমার ছেলে বলে দিয়েছে ওটি হচ্ছে না। ছোটকাকার ঘরের ওপর আগে তার...
অদিতি ক্লান্ত পায়ে নেমে আসছিল। কী ক্রূর এক পরিবেশে বাস করে হেমেনমামা, অথচ একবারও তাকে হাসিমুখ ছাড়া দেখা যায় না ! হেমেনমামা একা থাকে জানত অদিতি, কিন্তু এত একা ! আর এই সাহিত্যপ্রাণ মানুষটিকে অবলীলায় অপমান করে দিল সুপ্রতিম ! হেমেনমামা বলে আমার মধ্যে সেই তীব্র অনুভূতিটাই নেই অদিতি ! যা লিখেছি সব বড় জোলো মনে হয় ! তীব্র অনুভূতি কাকে বলে ? এই যে হেমেনমামা নিজের জীবনটাকেই জলাঞ্জলি দিয়ে লেখক গড়ার নেশায় মেতে উঠেছেন, এই নিঃস্বার্থ পিপাসাকে তবে কী বলা যায় ?
শীতের দুপুর দৌড়চ্ছে বিকেলের দিকে। হিমেল হাওয়া ঝাপটে আসে হঠাৎ হঠাৎ। রোদ্দুর বড় মলিন এখন। ম্রিয়মাণ।
অদিতি বাড়ি ফিরছিল। এক অন্য অদিতি।

॥ ষোলো ॥

শ্রীচরণেষু হেমেনমামা,

আপনার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি। সম্ভবত এই শেষ। সুপ্রতিমের আচরণের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য এ চিঠি লিখছি না। সুপ্রতিমের কাজের দায় সুপ্রতিমেরই, আমার নয়। এই চিঠি একান্তই আমার কথা।

আপনি আমার জীবনে এসেছিলেন এক ধূমকেতুর মতো। দিব্যি আধো ঘুমে আধো জাগরণে জীবনটা কেটে যাচ্ছিল আমার, আপনি এসে সব তছনছ করে দিলেন। কেন আমার মধ্যে ভাবতে শেখার নেশাটা ঢুকিয়ে দিলেন হেমেনমামা ? আমার মতো এক অতি সাধারণ মেয়ে, বয়সের জন্য যাকে আপনি মহিলাও বলতে পারেন, তার তো জন্মই হয়েছে একটা খাতে বয়ে যাওয়ার জন্য। যেভাবে আরও আরও অসংখ্য মেয়েদের জীবন আদিগন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে। স্বামী সন্তান সংসার, দেখতে দেখতে এক সময়ে একা হয়ে যাওয়া, বার্ধক্যের প্রতীক্ষা, মৃত্যুর জন্য বসে থাকা। আমিও তো তিল তিল করে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম স্বামী আর ছেলেদের মধ্যে। জানতাম এটাই নিয়ম, এটাই আমার বেঁচে থাকা। কেন আপনি শেখালেন নিজেদের কুচি কুচি করে সংসারে বিলিয়ে দিয়েও আরও কিছু পড়ে থাকে মেয়েদের ? কেন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেন আমিও চেষ্টা করলে কিছু করতে পারি ? আমিও দিব্যি আপনার চক্করে পড়ে ভাবতে শুরু করলাম আমিও একটা আস্ত মানুষ। ভাবতে পারি। দেখতে পারি। লিখতে পারি। কী বোকামি, কী বোকামি ! ছেলেরা শিল্পী লেখক হতে গিয়ে যদি বোহেমিয়ান হয়ে যায়, সেও তো তাদের একটা গুণ, অথচ মেয়েরা লিখুক আঁকুক যাই করুক, তাদের কিন্তু থাকতে হবে এক লক্ষ্মণরেখার মধ্যে। সংসারের গণ্ডিটুকু আঁকড়ে ধরে। সেখানে কোনও বেচালপনা সহ্য করবে না কেউ। কেন যে আপনি কদিনের জন এ-সব কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে ! সুপ্রতিম একশো ভাগ পুরুষ, সে আমাকে ঠিক সময়ে সমঝে দিয়েছে কোথায় আমার সীমা।

একটা প্রশ্নের উত্তর শুধু ভীষণভাবে জানতে ইচ্ছে করে। অদিতি কে ? সুপ্রতিম মজুমদারের স্ত্রী ? পাপাই তাতাইয়ের মা ? তাদের প্রয়োজনটুকুর জন্যই কি অদিতির নারীজন্ম ? শুধু অদিতির কাছেই কি অদিতির কোনও অস্তিত্ব নেই ?

সময় আমার চলে গেছে হেমেনমামা। যেটা পাঁচে হওয়ার কথা, সেটা পঞ্চাশে আর জোর করে হয় না। হওয়াতে গেলে যে জটিলতা আসে তাকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা আমাদের মতো সাধারণ মহিলাদের নেই। দুপুর আমার আসবে, গড়িয়ে পারও হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু সুজাতা বলে সংসার হল

গিয়ে দড়ির ওপর হাঁটা। আমার সামনের ফ্ল্যাটের এক বৃদ্ধা দিনরাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন, রোদ্দুর আলো বাতাসের গন্ধ নেন। পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা সুযোগ পেলেই পরের ঘরের কেচ্ছা শোনায়। আশীর্বাদ করুন, আমিও যেন এদের মতোই এবারকার ভোঁতা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

আমি আর লিখব না হেমেনমামা। চেনা সংসারে অচেনা মানুষদের নিয়ে জীবন কাটানোই আমার নিয়তি। আপনি দূরে থাকুন, ভাল থাকুন।

কীসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। প্যাসেজে। অদিতি কান পাতল। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল টিয়ার!

সুপ্রতিম অকাতরে ঘুমোচ্ছে। উষ্ণ লেপে নিজেকে পুরোপুরি মুড়ে। শীতের ভোরে এই ঘুমটা বড় প্রিয় সুপ্রতিমের।

অদিতি টেবিল ল্যাম্প নেবাল। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে বন্ধ ঘর থেকে। কোত্থেকে এক চিলতে প্রভাতী কিরণ এসে পড়েছে অদিতির নিঝুম ফ্ল্যাটে। সেই আলোটুকুর দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে আছে টিয়া। অস্ফুট স্বরে ডাকছে, কঁক কঁক।

অদিতির এতটুকু মায়া জাগল না পাখিটাকে দেখে। ব্যালকনির দরজা খুলল, ভাল করে গায়ে শাল জড়িয়ে খাঁচা নিয়ে এসেছে বাইরে।

সামনে এক নির্দয় শীতের ভোর, কুয়াশাহীন। আকাশে এখনও চাঁদ দেখা যায়, পাণ্ডুর এক ক্ষয়-রুগীর মতো বিরাজ করছে একা একা। ভয়ানক ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছে পৃথিবী।

অদিতি টিয়ার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, —কীরে, ওড়ার শখ হচ্ছে?

টিয়া আওয়াজ করল, —কঁক কঁক।

—ডানায় জোর আছে তোর? উড়তে পারবি?

টিয়া একটু নেচে উঠল, —কঁক কঁক।

অদিতি খাঁচার দরজা খুলল। ঝটকা টানে বার করল পাখিকে। সঙ্গে সঙ্গে কোমল উত্তাপ চারিয়ে গেছে শরীরে।

টিয়া ডেকে উঠল, —খুকু। খুকু।

অদিতি হিংস্র চোখে তাকাল, —খুকু মরে গেছে। তুইও মর্। বলেই পাখিটাকে ছুড়ে দিয়েছে গ্রিলের বাইরে।

ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পড়ছে পাখি। টলতে টলতে উড়ছে। ভূমির কাছে গিয়েও নিজেকে টেনে নিয়ে গেছে কার্নিশে।

অদিতি দাঁতে দাঁত ঘষল। বিড়বিড় করে বলল, —খাক্, তোকে বেড়ালে খাক্।

পাখি কি শুনতে পেল? কার্নিশ ছেড়ে সাঁ করে উড়ে গেল সামনের ফ্ল্যাটের

ছাদে, বসেছে টিভির অ্যান্টেনায়। দূর থেকে একবার ঘাড় ফেরাল অদিতির দিকে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেমে এল গুলমোহর গাছে। সেখান থেকে উড়ে যাচ্ছে আবার।

উড়ছে। উড়ছে। দেখতে দেখতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল পাখি।

অদিতির শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। উড়ে গেল পাখিটা! দুর্বল ডানা নিয়ে! একি পাখিরই ক্ষমতা, নাকি মুক্তির সম্মোহনী টান!

পাখির গতিতে টেবিল থেকে চিঠিটা নিয়ে এল অদিতি। দু হাতে কুটি কুটি করে ছিঁড়ল। ভাসিয়ে দিল বাইরে।

এক অদিতি লক্ষ অদিতি হয়ে ভাসছে শূন্যে। ভাসছে।